পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

এ. মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজিং ডিরেক্টার

এ, মুখার্জ্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৬৪

মূল্য ৩৲ (তিন টাকা) মাত্র

মুদ্রাকর

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৫, চিন্তামণি দাস লেন

কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

পরম ভক্তিভাজন

অধ্যাপক

৺অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্. এ. মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীভগবানের অনুগ্রহে এতদিনে পেশবাদিগের রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর অনুরোধে "ভারতবর্ষে" পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি। নানারূপ দৈব-দুর্ব্বিপাকে প্রত্যেক মাসে প্রবন্ধ লেখা হয় নাই, অনেক সময়ই ভারতবর্ষের সম্পাদক পূজনীয় জলধর সেন মহাশয় আমার বিলম্ব-জনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া কোনরূপে ভারতবর্ষের স্তম্ভে শেষ মুহূর্ত্তে প্রদত্ত আমার প্রবন্ধ ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলে কোন দিন এই প্রবন্ধগুলি শেষ করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। ইচ্ছা ছিল যে, আমার ইংরাজী গ্রন্থ Administrative System of the Marathas মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পেশবাদিগের শাসন-পদ্ধতি পুস্তকাকারে বাহির করিব। কিন্তু কোন ব্যবসায়ী প্রকাশকই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা সত্ত্বেও তৎপ্রকাশিত হৃষীকেশ সিরিজে এই গ্রন্থের স্থান না দিলে আমার পক্ষে কোনকালে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। এই জন্য আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবার অল্পকাল পরেই কার্য্যানুরোধে আমাকে সুদূর বিদেশে যাইতে হইয়াছিল। পুস্তকের পাণ্ডুলিপির অবস্থা তখন ভাল ছিল না এবং প্রথম হইতে প্রুফ দেখার সুবিধাও আমার হয় নাই। এই জন্য অনেক জায়গায় পৃষ্ঠা ও অধ্যায়ের পারম্পর্য্য রক্ষিত না হওয়ায় ডাঃ লাহাকে অতিরিক্ত অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া অনেকগুলি পৃষ্ঠা নূতন করিয়া ছাপাইতে হইয়াছে। তাঁহার পক্ষ হইতে কোন ত্রুটি না হইলেও আমার অনিবার্য্য অনুপস্থিতির জন্য কতকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠক এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থ রচনার সময় এবং তাহার পরে যাঁহাদের নিকট উৎসাহ ও অন্যবিধ সাহায্য লাভ করিয়াছি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নানাবিধ ত্রুটি থাকিলেও মারাঠাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই প্রথম পুস্তক। এই জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ইহাকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিলে আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব।

১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৭
৬।৩, একডালিয়া রোড,
বালিগঞ্জ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষে প্রথম বাহির হয়। তারপর ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তাঁহার "হৃষীকেশ গ্রন্থমালায়" এই পুস্তকটিকে স্থান দিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন। সে প্রায় ত্রিশ বৎসর আগের কথা। তখন এই শ্রেণীর পুস্তক বিক্রয় হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াই ডাঃ লাহা এই কার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া তিনি আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

প্রথম সংস্করণ যখন ছাপা হয় তখন আমি দেশে ছিলাম না। সুতরাং অনিবার্য্য কারণে অনেকগুলি ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছিল। সেই ভুলগুলি সংশোধন করা ব্যতীত দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই, কেবল পরিশিষ্টে একটি অতি প্রচলিত মারাঠী সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার ফলে স্থানে স্থানে কিছু কিছু কাল ও পাত্র সম্বন্ধীয় অসঙ্গতি দেখা যাইবে। তখন যে সকল মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত জীবিত ছিলেন এখন তাঁহারা লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। সানে, রাজবাড়ে, পারসনীস, খরে, ভট, ও আপটে এখন আর জীবিত নাই। পাণ্ডোবা পটবর্দ্ধনও বহুদিন হইল দেহরক্ষা করিয়াছেন। অসীম শ্রদ্ধার সহিত

ইহাদিগের পুণ্য কীর্ত্তি স্মরণ করিতেছি। ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডলের কথা এখন শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন। ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সর্দ্দার মেহেন্দলে পরলোকগত। সুখের বিষয় এই প্রতিষ্ঠানের দুই আশ্রয়-স্তম্ভ, মহামহোপাধ্যায় দত্তো পন্ত পোতদার ও সর্দ্দার মজুমদার এখনও জীবিত। নূতন নূতন কর্ম্মীর সেবায় এই প্রতিষ্ঠানের সত্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। তাঁহাদের কেহ প্রবীণ, কেহ নবীন। আমি তাঁহাদের সকলকেই প্রণাম জানাইতেছি।

প্রথম সংস্করণে "গত চল্লিশ বৎসরের" গবেষণার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহার পর আরও ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু মহারাষ্ট্রের অফুরন্ত ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিবার চেষ্টার এখনও বিরাম নাই। প্রত্যেক বৎসরই নূতন নূতন কাগজ পত্র বাহির হইতেছে। ইংরাজ আমলেই বোম্বাই সরকারের অর্থানুকূল্যে রাও বাহাদুর গোবিন্দ সখারাম সরদেসাইর সম্পাদনায় ৪৫ খণ্ডে পেশবা দপ্তরের দলিল-পত্র বাহির হইয়াছিল। সরদেসাই এখন অতিবৃদ্ধ। সানে একদিন মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিকদিগের নিকট ভীষ্ম পিতামহ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সরদেসাই এখন সেই সম্মানের অধিকারী। তাঁহার বয়স পঞ্চনবতি অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু এখনও গবেষণায় তাঁহার ক্লান্তি নাই।

মারাঠা ইতিহাস সম্বন্ধে ইংরাজী ও বাঙ্গলায় আমি যে সামান্য কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলাম তাহা বহুদিন হয়

দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। পুরাতন পুস্তকের দোকানেও তাহা পাওয়া যায় না। অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল যে পুস্তক-গুলির সম্পূর্ণ পরিশোধিত সংস্করণ বাহির করিব। কিন্তু সময় ও স্বাস্থ্যের অভাবে এ পর্য্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই, কতদিনে তাহা সম্ভব হইবে, আদৌ হইবে কিনা জানি না, সুতরাং কয়েকজন শুভার্থীর আগ্রহে পুরাতন সংস্করণেরই পুনরাবৃত্তি করিলাম।

এই সংস্করণ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছেন কলিকাতার প্রখ্যাত প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তাঁহার আর্থিক ক্ষতি না হইলেই আমি আনন্দিত হইব। ইতি,

১লা শ্রাবণ, ১৩৬৪
৬নং একডালিয়া প্লেস
কলিকাতা-১৯

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

সূচীপত্র

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

শাসন-তন্ত্র

বাল্যকালে স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়িয়াছি, মারাঠারা দস্যুর জাতি। তাহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি লুণ্ঠন, তাহাদের যুদ্ধ-নীতির একমাত্র ভিত্তি লুণ্ঠন;—লুণ্ঠনই তাহাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন, জাতীয় নীতির একমাত্র চরম লক্ষ্য। বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রমে ইংরেজ ঐতিহাসিকের এই সিদ্ধান্ত মুখস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাল্য অতিক্রম করিবার পর, আর মনে-মনে ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেমন যেন মনে খট্‌কা লাগিয়াছে,—কেবল লুঠ-তরাজের উপর যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহা দীর্ঘ দেড় শতাব্দীকাল টিকিয়া গেল কেন,—কেমন করিয়া? গ্রাণ্ট ডফের গ্রন্থ যত্ন-সহকারে পাঠ করিলাম। উত্তর মিলিয়া গেল, মারাঠা-সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতাগণ কেবল যোদ্ধা বা দস্যু ছিলেন না। প্রথম মাধব রাওয়ের মত দূরদর্শী নৃপতিদের চিত্ত কেবল দিগ্বিজয়ে নিবদ্ধ ছিল না, বিজিত রাজ্যের সুশাসনের প্রতিও তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য কেমন করিয়া কোন্ নীতি অনুসারে শাসিত হইত, তাহার বিশেষ সন্ধান গ্রাণ্ট ডফের ইতিহাসে পাইলাম না। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, মারাঠাজাতির রাজনৈতিক ইতিহাস। এই গ্রন্থে তিনি অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও পাণ্ডিত্য সহকারে তারিখের পর

তারিখ মিলাইয়া, ঘটনার পর ঘটনা সাজাইয়া গিয়াছেন। মারাঠাদিগের শাসন পদ্ধতির ইতিহাস তিনি রচনা করেন নাই। সে সময়ে বোধ হয় তাহার যথেষ্ট উপাদানও ছিল না।

গত চল্লিশ বৎসর কালের মধ্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি বহু অনুসন্ধিৎসু ছাত্রের ও পণ্ডিতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। যে সমস্ত পণ্ডিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও মার্কিনের সংখ্যাই বেশী। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে একদল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ভারতীয় পণ্ডিতও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নব-প্রবর্ত্তিত শিক্ষানীতির ফলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বহু বাঙ্গালী ছাত্রও আজকাল ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগের তত্ত্বানুসন্ধানে অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। বাঙ্গালা মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায়ও ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া যাইবে। মারাঠা পণ্ডিতগণের মধ্যে স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিশ্ববিশ্রুত কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক এই সময়ের মধ্যেই একদল মারাঠা ঐতিহাসিক অদ্ভুত আত্মত্যাগ, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত মহারাষ্ট্রের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে পরলোকগত বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের নাম বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে, কারণ রাণাডের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি ইংরাজীতে লিখিত। রাণাডেই তাঁহার "মারাঠা শক্তির উত্থান" নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে

সর্ব্বপ্রথম ইঙ্গিত করেন যে, মারাঠা জাতির উত্থান একেবারে আকস্মিক নহে; এবং মারাঠা জাতীয় জীবনের জনক শিবাজী কেবল মাত্র যোদ্ধা বা লুণ্ঠন-নিরত দস্যু ছিলেন না। রাণাডের গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, পরলোকগত রাও বাহাদুর গণেশ চিমনাজী বাড সঙ্কলিত পেশবা দপ্তরের কতকগুলি মূল্যবান্ প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিল প্রকাশিত হয়। এই দলিলগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিবার জন্য বিচারপতি রাণাডে তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ স্থগিত রাখেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পণ্ডিতপ্রবর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। তাহার পর "পেশবা-দপ্তরের দলিলসংগ্রহ" নয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশিনাথ রাজবাড়ের বিপুল চেষ্টায় বহু সহস্র প্রাচীন দলিল ও লিপি প্রায় ২৪ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। রাজবাড়ে বলেন যে, আরও শতাধিক খণ্ডের অপ্রকাশিত উপাদান তাঁহার নিকটে আছে। রাজবাড়ের "মারাঠা ইতিহাসের উপাদান" পাণ্ডিত্য ও স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ চিরদিন সম্মানিত হইবে। দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের পটবর্দ্ধন-পরিবারের কাগজপত্র, শ্রীযুত বাসুদেব বামন শাস্ত্রী খরে "ঐতিহাসিক লেখ-সংগ্রহ" নাম দিয়া তের খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের বিপুল ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য খরে মহাশয় ঘর-বাড়ী সমস্ত বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয়

বলবন্ত পারসনীস সম্পাদিত "ইতিহাস-সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রে, রাজবাড়ে সম্পাদিত "ইতিহাস ও ঐতিহাসিকে" এবং "রামদাস ও রামদাসীতে" বহু প্রাচীন দলিল ও চিঠি-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে। রাও বাহাদুর কাশিনাথ নারায়ণ সানে, রাজবাড়ে ও পারসনীসেরও পূর্ব্বে "কাব্যেতিহাস সংগ্রহে" কতকগুলি মারাঠী বখর ও চিঠিপত্র বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে সম্পাদন করিয়া, টীকাটিপ্পনী সহ, মুদ্রিত করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, প্রধানতঃ রাজবাড়ের চেষ্টায় মারাঠা ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশের জন্য, "ভারত-ইতিহাস-সংশোধক-মণ্ডল" নামক একটি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। মণ্ডলের সম্পাদক সর্দ্দার মেহেন্দলে ও শ্রীযুক্ত পোতদারের অক্লান্ত পরিশ্রমে মারাঠা ইতিহাসের বহু উপাদান সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মণ্ডলের সদস্যগণ ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশের বিরোধী। তাঁহাদের গবেষণার ফল মারাঠী ভাষায়ই লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হয়। সুতরাং মহারাষ্ট্রে জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনের এই বিরাট চেষ্টার কথা বঙ্গদেশে এখনও অবিদিত রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় এবম্বিধ চেষ্টা বিরল না হইলেও, মারাঠা পণ্ডিতগণের বিরাট আত্মত্যাগ এ প্রদেশে মোটেই সুলভ নহে। বিশ্বনাথ রাজবাড়ে ইতিহাসের সাধনার জন্য কুমার-জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার মাসিক ব্যয় আট টাকার অধিক ছিল না। ভূমিতলে কম্বল পাতিয়া তিনি আপনার সুখ-শয়ন রচনা করিতেন। দেশ-ভ্রমণে তাঁহার চরণ-যুগলই সকল প্রকার যান-বাহনের প্রয়োজন সাধন করিত।

মহারাষ্ট্রের এই আত্মত্যাগ বঙ্গের একান্ত অনুকরণীয়। রাজবাড়ের মত বিদ্যানুরাগী সন্ন্যাসীর অধ্যবসায়ে পেশবাদিগের শাসন-পদ্ধতির বিবরণ সঙ্কলন করিবার সময় এখন আসিয়াছে।

২

পেশবাগণ মারাঠা সাম্রাজ্যের নায়ক ছিলেন, কিন্তু সম্রাট্ ছিলেন না। তাঁহাদের বিরাট বাহিনী ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের "ভগবাঝাণ্ডা" বা জাতীয় পতাকা বহন করিয়াছে,—মহারাষ্ট্রের পার্ব্বত্য অশ্ব আটকে সিন্ধু নদের জল পান করিয়াছে,—কিন্তু পেশবাগণ কখনও স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিগণিত হন নাই। শাহুর জীবিতকালে বালাজী বিশ্বনাথ যেমন তাঁহার "মুখ্য প্রধান" মাত্র ছিলেন, তাঁহার বংশধর দ্বিতীয় বাজীরাও তেমনই নামে অন্ততঃ শাহুর বংশধর সাতারার বন্দী ছত্রপতি প্রতাপ সিংহের "মুখ্য প্রধান" ছিলেন। মারাঠা ছত্রপতি আবার কার্য্যতঃ ছিলেন তাঁহারই কর্ম্মচারী পেশবার বৃত্তিভোগী বন্দী, আর নামে ছিলেন মোগল বাদশাহের করদ সামন্ত। মোগল বাদশাহ্, কেবল মাত্র নামে হইলেও, ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ নানা ফড়্নবীস আপনার আত্মজীবনীতে দিল্লীর বাদশাহ্কে পৃথ্বীপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গণেশকৃষ্ণ নামক মারাঠা কর্ম্মচারী ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দেও তাঁহার একখানি পত্রে দিল্লীর নাম-শেষ বাদশাহ্কে "সার্ব্বভৌম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ছত্রপতি সাম্ভাজীর বিধবা য়েসুবাঈএর একখানি

পত্রেও দিল্লীর বাদশাহ্ সম্বন্ধে এই "সার্ব্বভৌম" শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছিল। আর মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনের ২৫ বৎসর পূর্ব্বে খর্ডার যুদ্ধগাথার অজ্ঞাত-নামা কবি মনে করিয়াছিলেন,—দৌলত রাও সিন্ধিয়া দিল্লীশ্বরের আদেশেই হিন্দুস্থান ও গুজরাট ছাড়িয়া দক্ষিণে আসিয়াছেন।

হিন্দুস্থান আণি গুজরাথ সোডুণ শিন্দে দক্ষণেত আলা। হুকুম কেলা বাদশাহানী ত্যালা॥

মারাঠা সাম্রাজ্যের শেষ দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ মহাদজী সিন্ধিয়া যখন অন্ধ ও অক্ষম দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে, পেশবা মাধবরাও নারায়ণের নিমিত্ত "বকীল-ই-মুতলুকে"র সনন্দ গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই সনাতন মারাঠা নীতির ও মারাঠা বিশ্বাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন, কোন নবীন নীতির প্রবর্ত্তন করেন নাই।

এইখানেই শিবাজী ও তাঁহার পৌত্র শাহুর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিবাজী স্বাধীন হিন্দু-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার গুরু রামদাসের নীতি—"যত মারাঠা, সকলকে এক পতাকা-মূলে মিলিত কর,—মহারাষ্ট্র ধর্ম্মের বৃদ্ধি সাধন কর।" শিবাজী কেবল মাত্র "ছত্রপতি" উপাধি ধারণ করেন নাই, তিনি "গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক" বলিয়া সম্মানিত হইতেন। মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও তাহার স্থানে হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এই জন্য তিনি সাধ্য-পক্ষে মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। শাহু বাল্যকালে মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরে

প্রতিপালিত। তাঁহার পিতামহের মত কষ্ট-সহিষ্ণুতা তাঁহাতে আশা করাই অন্যায়। বাল্যে হয়ত তিনি তাঁহার মোগল-শিক্ষকের নিকট শুনিয়া থাকিবেন যে, তাঁহার পিতামহ শিবাজী পার্ব্বত্য দস্যু ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। রাজভক্তির পাঠটা তিনি খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। তাই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, যখন মোগল-সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ, তখনও দক্ষিণে স্বীয় স্বাধীনতা প্রচার না করিয়া, শাহু দুর্ব্বল ফিরকসিয়রের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, দশ-হাজারী মন্সব গ্রহণ করিলেন। পরলোকগত অধ্যাপক হরিগোবিন্দ লীময়ের নিকট শুনিয়াছি যে, শাহু মহারাজ পুণার দিল্লী দরোয়াজা নির্ম্মাণের বিরোধী ছিলেন—কারণ উত্তরের দিকে তোরণ ও দরোয়াজা নির্ম্মাণ করিলে সম্রাটের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে। শাহু সত্য-সত্যই দিল্লীর সম্রাটের প্রাধান্য ন্যায়সম্মত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আর পেশবাগণ এই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতেন সুবিধার অনুরোধে। তাঁহারা মালব বিজয় করিলেন বাহুবলে, কিন্তু তার পর দখলী-স্বত্বটা আইন অনুসারে পাকা করিবার জন্য আবার একটা বাদশাহী পরোয়ানা যোগাড় করিলেন। তখনকার দিনে কেহই ইহা অস্বাভাবিক বা অনাবশ্যক মনে করেন নাই। এমন কি ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্বীয় রাজধানী হইতে পলাতক, পরানুগ্রহজীবী।

মারাঠা সাম্রাজ্যে দিল্লীর সম্রাটের নীচেই সাতারার ছত্রপতি

মহারাজার স্থান। পেশবা, প্রতিনিধি, সচিব প্রভৃতি তাঁহারই কর্ম্মচারী; তিনিই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। যখন সাতারার রাজা সকল ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত, তখনও সাম্রাজ্যের প্রধান-প্রধান নায়কগণ তাঁহাদের পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইতেন তাঁহারই নিয়োগ-পত্রের বলে। মারাঠা সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্তও এই প্রথার কখনও ব্যত্যয় হয় নাই। এমন কি, যে বাজীরাও রঘুনাথ আপনার সামন্তদিগের অধিকার সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তাঁহার সময়েও শিবাজীর বংশধরের এই ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি স্বীয় পদের নিয়োগপত্র ও বস্ত্রের নিমিত্ত আবাজী কৃষ্ণ শেলুকর নামক একজন কর্ম্মচারীকে সাতারার দরবারে পাঠাইয়াছিলেন। ছত্রপতি মহারাজের নিকট হইতে নিয়োগপত্র সংগ্রহ করা কিন্তু মোটেই কঠিন ছিল না। নানা ফড়্নবীস ও পরশুরাম ভাউ পটবর্দ্ধন যখন ষড়যন্ত্র করিয়া রঘুনাথ রাওয়ের কনিষ্ঠ পুত্র চিমনাজীকে বলপূর্ব্বক দ্বিতীয় মাধবরাওএর বালিকা-পত্নী যশোদা বাঈয়ের অঙ্কে দত্তক পুত্র রূপে স্থাপিত করিয়া, সাতারায় নিয়োগপত্রের জন্য আবেদন করেন, তখন তাঁহারা বিফল-মনোরথ হয়েন নাই। আবার রঘুনাথ রাওয়ের দত্তক পুত্র অমৃতরাও যখন যশোবন্ত রাও হোলকরের প্ররোচনায়, ভ্রাতাকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় পুত্র বিনায়ক রাওকে পেশবাদিগের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তখনও সাতারা হইতে নিয়োগপত্র ও বস্ত্রালঙ্কার সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। হোলি

রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট্‌গণের পক্ষে রোমে অভিষেক যেমন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত, পেশবাদিগের পক্ষেও সাতারার ছত্রপতি মহারাজের সনন্দ সেইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। তফাতের মধ্যে এই যে, মধ্যে মধ্যে রোমের পোপ কোন-কোন সম্রাটের অভিষেকে আপত্তি করিতেন, আর শিবাজীর অযোগ্য বংশধরের সে শক্তি বা সাহস কিছুই ছিল না। তাঁহারা দুর্দ্দশার এত নিম্নস্তরে পৌঁছিয়াছিলেন যে, নজরের কয়েকটি টাকা পাইবার জন্য সকল প্রকার সনন্দ ও নিয়োগপত্রেই স্বাক্ষর করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

পেশবাগণ নিয়োগপত্র সংগ্রহ করিতেন ছত্রপতি মহারাজের নিকট হইতে ; অন্যান্য সামন্তগণ নিয়োগপত্রের নিমিত্ত আবেদন করিতেন পেশবার নিকটে। পেশবা তাঁহাদের হইয়া ছত্রপতির দরবারে তদ্বির করিতেন। ১৭৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মাধবরাও অচ্যুতরাও নামক এক ব্যক্তির নিকট লিখিয়াছিলেন যে, প্রতিনিধির পদে পূর্ব্ববৎ শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে বাহাল করা গেল, তাঁহাকে ঐ পদে নিয়োগসময়োচিত-বস্ত্রের নিমিত্ত সাতারায় পাঠান গেল। শ্রীনিবাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পরশুরামের নিমিত্ত মাধবরাও সাতারা হইতে নিয়োগপত্র আনাইয়াছিলেন। আবার ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মাধবরাওই জীবনরাও বিঠ্‌ঠলের সুমন্ত পদের সনন্দের নিমিত্ত বাবুরাও কৃষ্ণের নিকট অনুরোধ-পত্র লিখিয়াছিলেন। এই বাবুরাও কৃষ্ণ ছিলেন পেশবারই কর্ম্মচারী। তিনি নামে ছিলেন সাতারার দুর্গাধ্যক্ষ ; কার্য্যতঃ তিনি সাতারার বন্দী মহারাজের কারা-রক্ষক।

সাতারার মহারাজ সাম্রাজ্যের সকল সামন্তকে সনন্দ দান করিতেন বটে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার কিছুই ছিল না। সাতারার দুর্গে তিনি বন্দী ছিলেন। একজন সামান্য ভৃত্য নিযুক্ত করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। তাঁহার খিদ্‌মতগার আসিত পুণা হইতে। তাহারা বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিত পেশবার নিকট। একবার সাতারার দুর্গে দাঙ্গা করিবার অপরাধে ছত্রপতি মহারাজ কয়েকজন কর্ম্মচারীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন,—কিন্তু তৎকালীন পেশবার আদেশে এই দণ্ড একেবারে রহিত হইয়াছিল।

সাতারার রাজার সহিত বোধ হয় মারাঠা সাম্রাজ্যের নিম্নতম সেনানায়কও অবস্থা-পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইত না। একে তিনি সমস্ত ক্ষমতা-বঞ্চিত বন্দী, তাহাতে আবার তাঁহার আর্থিক দুরবস্থার সীমা ছিল না। একখানি মারাঠী পত্রে প্রকাশ যে, ছত্রপতি মহারাজের শাক উৎপাদন করিবার বাগান নাই,—পেশবা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে তদুপযোগী একখণ্ড ভূমি দান করিলেন। আর একখানি পত্রে প্রকাশ যে, যবতেশ্বরের শৈল হইতে সাতারার প্রাসাদে জলবাহী নল খারাপ হইয়াছিল বলিয়া পেশবার কর্ম্মচারী মেরামতের নিমিত্ত ৪০০০৲ টাকা চাহিয়াছিলেন—কিন্তু পেশবা সরকার ৮০০৲ টাকার অধিক মঞ্জুর করেন নাই। ছত্রপতি মহারাজকে সাধারণ গৃহস্থেরাও অনেক সময় তুচ্ছ করিত। সদাশিব মাবলঙ্গকর নামক এক ব্যক্তি সত্যসত্যই ছত্রপতি মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ সম্ভাজী মহারাজের একটি প্রাসাদের ভিত্তির উপর

গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথম মাধব রাওয়ের অনুগ্রহে সাতারার বন্দী নৃপতির অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু পেশবাদিগের পতনের পূর্ব্বে তিনি কখনও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন নাই।

সম্রাট ও ছত্রপতির নীচেই পেশবার স্থান। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত নায়ক তিনিই। কিন্তু হইলে কি হয়, আইনের হিসাবে তিনি অষ্ট-প্রধানের একজন মাত্র। শিবাজীর সময় আবার প্রধানগণকে সময়-সময় এক পদ হইতে অপর পদে বদলী করা হইত ;—যেমন ইংরাজ আমলে শিক্ষাসচিবকে রাজস্বসচিবের পদে বদলী করিয়া দেওয়া যাইত। শিবাজীর সময় আবার কোন পদেই কাহারও উত্তরাধিকারের দাবী থাকিত না। ভটবংশের প্রথম পেশবা বালাজী বিশ্বনাথের পূর্ব্বে আরও ছয়জন পেশবার কার্য্য করিয়াছিলেন।* ইঁহাদের মধ্যে কেবল নীলকণ্ঠ মোরেশ্বর তাঁহার পিতা মোরো ত্রিম্বকের পরিত্যক্ত পেশবা পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভটবংশের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে পেশবা পদে কোন বংশবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ কোন দাবী ছিল না। সুতরাং সচিব, সুমন্ত, সেনাপতি প্রভৃতি অপরাপর প্রধানেরা আপনাদিগকে পেশবার সমকক্ষ বলিয়াই মনে করিতেন।

বেতন, ক্ষমতা ও সম্মানের হিসাবে পেশবা কিন্তু পুরাতন

* (১) শামরাজ নীলকণ্ঠ রোজেকর, (২) মোরো ত্রিম্বক পিঙ্গলে, (৩) নীলকণ্ঠ মোরেশ্বর পিঙ্গলে, (৪) পরশুরাম ত্রিম্বক, (৫) বহিরো মোরেশ্বর পিঙ্গলে এবং (৬) বালকৃষ্ণ বাসুদেব।

মারাঠারাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন না। সে হিসাবে প্রতিনিধির স্থান তাঁহার অনেক উপরে। পেশবার বেতন ছিল বার্ষিক ১৩,০০০ হোন (১ হোন=৩-৪ টাকা), আর প্রতিনিধি পাইতেন বার্ষিক ১৫,০০০ হোন। শিবাজী ও সাম্ভাজীর সময়ে প্রতিনিধি বলিয়া কোন কর্ম্মচারী ছিল না। সাম্ভাজীর প্রাণদণ্ডের পরে, যখন মহারাষ্ট্রের প্রায় সকল পর্ব্বত-দুর্গ একে-একে মোগলের হস্তগত হইল, তখন নিরুপায় রাজারাম পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে জিঞ্জী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোগলে ও মারাঠায় তখন জীবন-মরণের সংগ্রাম চলিতেছে, তখন মারাঠাদিগের একজন যোগ্য নেতার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। এই প্রয়োজনের অনুরোধে রাজারাম জিঞ্জী দুর্গে প্রহ্লাদ নিরাজী নামক একজন ব্রাহ্মণ রাজনীতিজ্ঞকে প্রতিনিধি পদে নিয়োগ করেন। প্রহ্লাদ তরুণ বয়সেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন; সভাসদ্ বলেন যে, শিবাজী মৃত্যুকালে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে মারাঠা জাতির সঙ্কট-কালে প্রহ্লাদই তাহাদিগকে আসন্ন বিনাশ হইতে রক্ষা করিবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছিল। প্রহ্লাদ নিরাজী সত্যসত্যই রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার পদসৃষ্টি হইয়াছিল মারাঠা জাতির বিপদের দিনে, সেই বিপদ কাটিয়া গেলেও প্রতিনিধির পদ ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিয়া গেল। কিন্তু ভটবংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রকৃত নেতৃত্ব প্রতিনিধির হস্ত হইতে পেশবার হস্তে চলিয়া গেল।

বালাজী বিশ্বনাথ বুদ্ধি-কৌশলে পেশবার পদে স্বীয় বংশের স্থায়ী অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু পেশবাদিগের প্রাধান্য স্থায়ী ভাবে স্থাপিত হয় ভটবংশের দ্বিতীয় পেশবা বাজীরাওয়ের সময়। শাহুর রাজত্ব-কালে উত্তর দিকে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রভূত প্রসার হইয়াছিল, বাজীরাও ছিলেন উত্তর-বিজয় নীতির পক্ষপাতী। আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনিধি চাহিয়াছিলেন, দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত মারাঠা-শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে। সাম্রাজ্যবাদী বাজীরাওয়ের সঙ্গে প্রতিনিধির এই বিষয় লইয়া অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়, বাজীরাও বলেন যে ভারত-সাম্রাজ্যের মূল দিল্লীতে,—মূলে আঘাত করিলেই সাম্রাজ্য-তরু পত্র-পুষ্প-শাখা-প্রশাখাসহ মারাঠার করতলগত হইবে। শাখা-প্রশাখা এক-একখানি করিয়া ছেদন করিবার প্রয়োজন হইবে না। রাজমণ্ডলের এক বিশেষ অধিবেশনে মারাঠা সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র-নীতির এই প্রশ্নের বিশেষ আলোচনার পরে বাজীরাওয়ের মত গৃহীত হয়। প্রতিনিধির নীতি প্রত্যাখ্যাত হইলে, তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভাব একেবারে তিরোহিত হইল।

আর শিবাজীর বংশধরগণ সাতারা দুর্গে বন্দী হইলেন ঘটনা-চক্রে। ছত্রপতি শাহু মৃত্যুকালে এক সনন্দ দ্বারা ভটবংশের তৃতীয় পেশবা বালাজী বাজীরাওকে রাজ্যশাসন করিবার স্বাধীন ক্ষমতা দিয়া যান। কিন্তু ঐ সনন্দের সর্ত্ত অনুসারে পেশবাকে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যই ছত্রপতি মহারাজের নামে করিতে হইত। শাহুর নিজের

পুত্রও সন্তান ছিল না। তাঁহার নিকটতম আত্মীয় কোহ্লাপুরের রাজার সহিত তাঁহার মোটেই সম্প্রীতি ছিল না। কোহ্লাপুরের রাজাকে দত্তক গ্রহণ করিলে ছত্রপতির অধিকার লইয়া বিবাদের অবসান হইত বটে, কিন্তু পেশবার প্রভাবও বোধ হয় অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইত। এই অবস্থায় স্বার্থের খাতিরে রাজারামের বিধবা পত্নী তারাবাঈ ও পেশবা বালাজী বাজীরাও এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তারাবাঈ পেশবার প্রাধান্যের মোটেই পক্ষপাতিনী ছিলেন না। কিন্তু তখনকার কোহ্লাপুরের রাজা তাঁহার সপত্নী-পুত্র। তেজস্বিনী তারাবাঈ চাহিতেন ক্ষমতা। স্বামী ও পুত্রের রাজত্ব কালে তিনিই প্রকৃত রাজ-ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার পুত্রের মৃত্যুকালে পুত্রবধূ গর্ভবতী ছিলেন, সেই গর্ভের সন্তানের যে কি হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় ছিল না। কোহ্লাপুরের সাম্ভাজীর প্রতি শাহুর বিদ্বেষের কথা তারাবাঈ ও বালাজী উভয়েই অবগত ছিলেন। সাম্ভাজী শাহুর উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হইলে তাঁহাদের উভয়েরই স্বার্থহানি ;—তাই তারাবাঈ ও বালাজী বাজীরাও পরামর্শ করিয়া এতকাল পরে তারাবাঈয়ের লুক্কায়িত পৌত্র দ্বিতীয় রাজারামকে তাঁহার অজ্ঞাতবাস হইতে বাহির করিলেন। শাহুর পরে রাজারাম সাতারার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু এই সময় হইতে তাঁহার দুর্ভাগ্যের সূচনা হইল। তারাবাঈ চাহিতেন ক্ষমতা, পেশবারও লক্ষ্য তাহাই। কাজেই তাঁহাদের ঐক্য স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পেশবা দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেই, তারাবাঈ তাঁহার

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। বরোদার গাইকবার সসৈন্যে তারাবাঈয়ের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু শিবাজীর অযোগ্য বংশধর দ্বিতীয় রাজারাম পিতামহীর সঙ্গে যোগ দিতে সাহসী হইলেন না। নীচজাতির গৃহে প্রতিপালিত রাজারাম রাজনীতি বা প্রভুত্বের অনুরাগী ছিলেন না, তিনি চাহিতেন আরাম। কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইয়া, এত সহজে পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী তারাবাঈ নহেন। তিনি রাজারামকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া সাতারার সেনাগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তার পর গাইকবারের পরাজয় হইল, তারাবাঈয়ের সহিত বালাজী বাজীরাও-এর সন্ধি হইল, পেশবার প্রভুত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু রাজারাম যে বন্দী ছিলেন, সেই বন্দীই রহিয়া গেলেন।

এইরূপে ছত্রপতির অন্যতম মন্ত্রী পেশবা ছত্রপতির প্রভু হইয়া বসিলেন। এই প্রভুত্ব কিন্তু এত নীরবে, এত সন্তর্পণে, এত ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তখনকার লোক বুঝিতেই পারে নাই যে তাহাদের চক্ষুর উপর এতবড় একটা রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়া যাইতেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্কট-ওয়ারিং লিখিয়াছেন—The usurpation of the Peshwas neither attracted observation nor excited surprise; indeed the transition was easy, natural and progressive. পেশবাদিগের প্রভুত্ব-লাভ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ বা বিস্ময়ের উদ্রেক করে নাই। এই পরিবর্ত্তন বাস্তবিকই সহজ, স্বাভাবিক ও ক্রমসম্পন্ন।

শাহুর রাজত্বকালেই পেশবাদিগের প্রভুত্বের সূত্রপাত, প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ-পরিণতি হইয়াছিল বলিয়া, কেহ-কেহ মনে করেন যে শাহু ভট পেশবাদিগের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন, তিনি নামে মাত্র রাজা ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার কিছুই ছিল না। কথাটা একেবারেই ঠিক নহে। মোগল অন্তঃপুরে প্রতিপালিত শাহুর নিকট তাঁহার পিতামহের সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতা বা তাঁহার অসংযত পিতার দুর্দ্দমনীয় সাহস প্রত্যাশা করিতে পারি না। শিবাজীর শাসন-পটুতা ও রাজনৈতিক গুণের কিয়দংশ শাহু উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবতকালে তিনি নামে এবং কার্য্যেও রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। রাণাডে বলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা না করিলেও, শাহুই তাঁহার সেনানায়কগণকে অভিযানে পাঠাইতেন; আবার তাঁহারই আদেশে বিজয়ী মারাঠা সেনাপতিগণ দেশে ফিরিয়া আসিতেন। ডাভইর যুদ্ধের পর তাঁহারই চেষ্টায়, পেশবা ও গাইকবারের মধ্যে গুজরাট বিভাগ হয়। যখন বালাজী বাজীরাও রঘুজী ভোঁসলার প্রতি শত্রুতাপরবশ হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হন, তখন রঘুজী ছত্রপতি শাহুর রাজশক্তির শরণ লইয়াছিলেন, আর বিজয়দৃপ্ত বালাজীকে শাহুর আদেশেই দক্ষিণে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মত শাহুর প্রতিও পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকগণ বড় অবিচার করিয়াছেন।

কেন যে শাহু মহারাজ নিজের উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত

করিয়া পেশবাকে সকল ক্ষমতার অধিকারী করিয়া গেলেন, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু কোহ্লাপুরের রাজা শম্ভুজী ছিলেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। আর রাজারামের বংশধরেরাই যে তাঁহার সিংহাসনের পথে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া যাওয়া সহজ ছিল না। নিজের সন্তান থাকিলে তিনি তাহার জন্য রাজকীয় তাবৎ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে পরিমাণে যত্নবান ও আগ্রহশীল হইতেন, খুল্লতাত বংশের জ্ঞাতি-শত্রুর জন্য তাঁহার ততটা যত্ন বা আগ্রহ হইবে কেন? পরিশেষে যাঁহাকে তিনি দত্তক গ্রহণ করিলেন, তিনিও রাজারামেরই বংশধর। তাঁহার জন্মকাহিনী, তাঁহার বাল্যের কথা রহস্য-জাল-সমাবৃত। এমন কি শাহুর জীবিত কালেই পেশবা ও তারাবাঈর বিপক্ষ-পক্ষ, খুব প্রকাশ্যে না হইলেও, দ্বিতীয় রাজারাম প্রথম রাজারামের পৌত্র কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ করিত। কে বলিবে শাহুর চিত্তেও সে সন্দেহের উদয় হয় নাই। কুম্ভকার-গৃহে প্রতিপালিত এই রাজকুমারটির বিরাট মারাঠা-বাহিনীর পরিচালনার অথবা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণের যোগ্যতা আছে কি না, সে বিষয়েও বৃদ্ধ শাহুর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু পেশবাগণকে তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। বালাজী বিশ্বনাথ হইতে বালাজী বাজীরাও পর্য্যন্ত তিন পুরুষকাল তাঁহারা বিশ্বস্তভাবে ছত্রপতি সরকারের সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদেরই নায়কতায় মারাঠার দিগ্বিজয়ী বাহিনী উত্তর ভারত পর্য্যন্ত মারাঠার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া আসিয়াছে। সুতরাং পেশবাগণের সুযোগ্য

হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিলে, রাজ্যের যে কোন অনিষ্ট হইবে না, এ বিষয়ে শাহুর কোন সন্দেহ ছিল না। অপর পক্ষে তাঁহার অজ্ঞাত-বাল্য উত্তরাধিকারীর উপর ততখানি আস্থা স্থাপন করিবার ভরসা তাঁহার হয় নাই। বোধ করি এই কারণেই দীর্ঘকাল বিশ্বস্ত সেবার পুরস্কার স্বরূপ তিনি ভট পেশবাগণের হাতে সকল ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার ফলে শিবাজীর বংশধরগণ যেমন একদিকে সকল ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তেমনই অপরদিকে আবার মারাঠা সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত হন নাই। যদি শাহুর সনদের বলে পেশবাগণ মারাঠা জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলেও শিবাজীর অযোগ্য বংশধরগণ বেশী দিন সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেন না। শাহুর বন্দোবস্তে মোটের উপর যে তাঁহাদের কেবল লোকসানই হইয়াছে, এমন কথা বলা চলে না। জাপানের ইতিহাসেও আমরা ঠিক এই রকমের একটা দৃষ্টান্ত পাই। মিকাডোর সহিত ছত্রপতির এবং শোগুণের সহিত পেশবার তুলনা করা যাইতে পারে। যদি মিকাডোগণ শোগুণের ক্রীড়নক মাত্র থাকিতে নারাজ হইতেন, তবে বোধ হয় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে, জীবন মরণের সংগ্রামে, তাঁহারা টিকিয়া থাকিতে পারিতেন না।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। ছত্রপতি মহারাজ যে কেবল রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহা নহে, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক সকল প্রকার

প্রশ্নের মীমাংসা করিবার একমাত্র অধিকারীও ছিলেন। পরে পেশবাগণও এই অধিকার অনুসারে বহু সামাজিক বাদবিতণ্ডার মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু পেশবাগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এই অধিকারটি তাঁহাদের জন্মগত ব্রাহ্মণ্য-লব্ধ। কিন্তু বাস্তবিক মারাঠা দেশে একটা নব হিন্দুভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই ভাবের প্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন অব্রাহ্মণ*। এই নব হিন্দুভাবের অন্যতম প্রচারক রামদাস ছিলেন শিবাজীর গুরু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। শিবাজী নিজেও তখনকার উদার ভাবের ভাবুক ছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়ামি তাঁহাতে ছিল না। এই উদার নরপতি হিন্দু শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে সমাজেরও নেতা হইলেন। তাঁহার "গো-ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক" উপাধি ইংলণ্ডরাজের "Defender of the Faith" উপাধিরই অনুরূপ। তবে য়ুরোপে যেমন রাষ্ট্র ও সংঘের (State এবং Church) বিরোধ হইয়াছে, এদেশে কখনও তাহা হয় নাই; কারণ প্রাচীন অথবা আধুনিক সকল হিন্দু রাজ্যেই রাজা সংঘের উপরও কতকটা কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা শিবাজী একজন শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর (পণ্ডিতরাও) পরামর্শ লইয়া করিতেন। রাজার অনুমোদন ব্যতিরেকে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কি সামাজিক কোন বিষয়েরই কোন ব্যবস্থা দিবার অধিকার ছিল না। পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ কাশিনাথ রাজবাড়ে তাঁহার "মারাঠ্যাচে

* Ranade, *Rise of the Maratha Power*, vol. I দেখুন

ইতিহাসাঁচা সাধনেঁ” নামক গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডে সাম্ভাজীর রাজত্ব-কালের একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, যাহার উল্লেখ এই প্রসঙ্গে অসমীচীন হইবে না। গঙ্গাধর রঘুনাথ কুলকর্ণী নামক এক ব্রাহ্মণ মুসলমান-হস্তে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় নিরুপায় হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তারপর অবস্থা-বিপাকে মুসলমানের অন্ন ব্যবহারও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। বৎসরাধিক অনিচ্ছাকৃত মুসলমান সংসর্গের পর গঙ্গাধর সুযোগ পাইয়া পলায়ন করিয়া দেশে আসিলেন, এবং জাতিতে উঠিবার জন্য আবেদন করিলেন। শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আবেদনের সপক্ষে মত প্রকাশ করিলে, ছন্দোগ্যামাত্য এই ঘটনা সাম্ভাজী মহারাজের গোচর করিলেন। তিনি গঙ্গাধরের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে অনুমতি দিলেন। এই প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিলেন অব্রাহ্মণ রাজা, ব্রাহ্মণ ছন্দোগ্যামাত্য নহে। ভারত-ইতিহাস-সংশোধক-মণ্ডলের সংগৃহীত একখানি দলিল হইতে জানা যায় যে, ছত্রপতি মহারাজের অন্যতম সামন্ত ক্ষত্রিয় আংগ্রিয়াগণও সামাজিক ব্যাপারের মীমাংসা করিবার অধিকার পরিচালনা করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা এই সকল ব্যাপারে ব্রাহ্মণদিগের উপর হুকুমজারী করিতেন, তাঁহাদিগের শাস্ত্রার্থ ব্যাখ্যার অপেক্ষা করিতেন না। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ পেশবাগণ অব্রাহ্মণ শাহুর সনদের বলেই মহারাষ্ট্রের তাবৎ সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

পেশবাদিগের অভ্যুত্থানের ফলে, মারাঠা ইতিহাসের ধারা দুই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে রাষ্ট্রের ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন তাহার অন্যতম ফল। আর এই সময় হইতেই মারাঠাদিগের ভিতর দুই শ্রেণীর অভিজাত সৃষ্টি হইল। প্রথম কথাটা বুঝিতে হইলে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর নীতির একটু আলোচনা করা দরকার। শিবাজীর সর্ব্বাপেক্ষা সুমহান্ কীর্ত্তি বোধ হয় এই যে, তিনি যখন মহারাষ্ট্রে জাতীয় ভাবের উদ্বোধন করেন, তখন ভারতবর্ষে কেন য়ুরোপেও জাতীয় ভাবের উন্মেষ ভাল করিয়া হয় নাই। ফরাসী বিপ্লবের যুগে বিপুল রক্ত-প্লাবনে ফরাসী দেশে ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশে জাতীয়তার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। তাহার বহু পূর্ব্বেই গুরু রামদাস ও শিষ্য শিবাজী জাতীয় ভাবের বিরাট শক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাল জাতীয় ভাবের আদৌ উপযোগী ছিল না, তাই শিবাজী ও রামদাসের সাধনায়ও তখনকার মহারাষ্ট্রে জাতীয় ভাব সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। মহারাষ্ট্র-চরিত্রের যে প্রধান ত্রুটি জাতীয়তার অন্তরায়, তাহা শিবাজীর শ্যেনদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যত দিন মহারাষ্ট্রের জায়গীরদার কেবল আপনার ব্যক্তিগত সম্মান, ব্যক্তিগত স্বার্থ অথবা জায়গীরের কথা ভাবিবে, ততদিন মহারাষ্ট্রে জাতীয় ঐক্য সংস্থাপন অসম্ভব। মারাঠা জায়গীরদারগণ দেশের কথা ভাবিত না, তাহারা ভাবিত নিজ নিজ জায়গীর-জমিদারীর কথা। যে কোন উপায়ে পৈতৃক

সম্পত্তি, বংশানুগত অধিকার রক্ষা করিতে পারিলেই তাহাদের হইল। শিবাজী এই জন্য জায়গীর-প্রথার যথাসাধ্য বিলোপ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার উদ্যোগ কিয়ৎ পরিমাণে সফলও হইয়াছিল। নূতন জায়গীর তাঁহার আমলে কাহাকেও বড় দেওয়া হইত না। রাজস্ব আদায় করিত রাজকর্ম্মচারিগণ, রাজস্ব তিনি ইজারা দিতেন না। কিন্তু সকল সময় প্রাচীন জায়গীরদারের জায়গীর কাড়িয়া লওয়া তিনি সমীচীন বোধ করেন নাই। শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী নিজের বিলাস-ব্যসন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, রাজ্যশাসনের ধার তিনি বড় একটা ধারিতেন না। কনিষ্ঠ পুত্র রাজারাম পিতার অনুসৃত নীতির উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিকূল ঘটনা-প্রবাহের তাড়নায়, তাঁহাকেই জায়গীর-প্রথার পুনরায় প্রচলন করিতে হইল। সমগ্র দেশ যখন শত্রুর করতলে, তখন বহু দুঃসাহসী মারাঠা শিলেদার জায়গীরের লোভে রাজ্য-জয়ে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া এই জায়গীর-লোলুপ সৈনিকগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তখনও কিন্তু ছত্রপতির জায়গীরদার ভৃত্যগণ স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে নাই, কিন্তু পেশবার অভ্যুত্থানের পরে, সকল পরাক্রমশালী জায়গীরদারই ভট-পরিবারের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে প্রয়াসী হইলেন। আংগ্রিয়া, ভোঁস্‌লা, গাইকবার, সকলেরই একমাত্র কামনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল, স্বাধীন রাজত্ব। ইহার ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যও য়ুরোপের “পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের” মত (Holy Roman

Empire) জায়গীরের সমষ্টি মাত্রে পরিণত হইল। এবং ইহার অন্তিম ফল হইল পেশবারই ক্ষমতা-হ্রাস।

পেশবাদিগের অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় অনিবার্য্য ফল অভিজাত সম্প্রদায়ে দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব। প্রাচীন অভিজাতবর্গের অধিকাংশ রাজমণ্ডলের সদস্য; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে পেশবার সমকক্ষ। তাঁহারা পেশবার আদেশ পালন করিতেন—তিনি ছত্রপতি মহারাজের প্রতিনিধি বলিয়া। আর নবীন অভিজাত সম্প্রদায় সকলেই পেশবার কর্ম্মচারী, আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র; যেমন সিন্ধিয়া, হোলকর, বুন্দেলে, পটবর্দ্ধন, বিঞ্চুরকর, ফডকে, ভিডে, রাষ্টিয়া প্রভৃতি। তাঁহারা পেশবাকে অন্নদাতা প্রভু বলিয়া সম্মান করিতেন, তাঁহার সেবা করিতে তাঁহারা ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিলেন। নানা ফড়্‌নবীস যখন তাঁহার আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "তাঁহার অন্ন বহুদিন খাইয়াছি, তিনি আমাদিগকে পুত্রবৎ কৃপা করিয়াছেন, এ শরীর তাঁহারই অন্নের" (বহুত দিবস অন্ন ভক্ষিলে, কৃপা পুত্রবত কেলী, ত্যাচেঁ অন্নাচে শরীর—কাশিনাথ নারায়ণ সানে সম্পাদিত পত্রে যাদী বগৈরে দেখুন), তখন তিনি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিজাতবর্গের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। এই সকল সর্দ্দার প্রথম প্রথম পেশবার আদেশ অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রতিপালন করিত। কিন্তু প্রাচীন অভিজাতগণ মনে করিতেন যে, পেশবাকে তাঁহারা যেটুকু সম্মান করেন, তাহা কেবল শিষ্টাচারের খাতিরে। ঠিক ঐ কারণেই তাঁহারাও পেশবার নিকট হইতে অনুরূপ ভদ্র ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে পারেন।

মারাঠা নৌবাহিনীর অধিনায়ক আংগ্রিয়া যখন পুণায় আসিতেন, তখন পেশবা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য নগর হইতে দুই মাইল অগ্রসর হইতেন। অতিথির দর্শনমাত্র অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেন। তারপর অতিথির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় আবাসগৃহে আসিয়া একই গালিচায় বসিতেন। বলা বাহুল্য যে, আংগ্রিয়া দরবারে আসিলে পেশবা দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন। পথে চলিবার সময় তাঁহার বামে চলিতেন।* যাধবরাও পুণায় আসিলে তিনিও পেশবার নিকট হইতে এইরূপ অভ্যর্থনা ও সম্মান লাভ করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার সম্মানার্থ বহু বন্দীকে কারামুক্ত করা হইত।† পেশবার গৃহে বা দরবারেই যে কেবল এই দুই শ্রেণীর অভিজাতের মধ্যে সমাদর ও সম্মানের তারতম্য ও পার্থক্য হইত তাহা নহে; প্রাচীন সর্দ্দারেরা নবীন সর্দ্দারদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বত্রই দাবী করিতেন। কোন যুদ্ধক্ষেত্রে যদি প্রতিনিধির মত হীনবল প্রাচীন সর্দ্দারও উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলেও সিন্ধিয়া, হোলকর প্রভৃতি পরাক্রমশালী আধুনিক সর্দ্দারকে প্রধান সেনাপতির সম্মান তাঁহাকে ছাড়িয়া

---

* পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ যাদী দেখুন।

† "শ্রীমন্ত নানা সাহেব পেশবা (বালাজী বাজীরাও) পিলাজী যাধবরাওকে কাকা বলিয়া ডাকিতেন। তিনি সরকার বাড়ীতে গেলে তাঁহার সম্মানার্থ সরকারী বন্দীখানা হইতে কয়েদী মুক্ত করা হইত।" পারসনীস মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ যাদী দেখুন।

দিতে হইত। প্রাচীন সর্দ্দারেরা এই সকল সম্মানে তাঁহাদের আইনসঙ্গত অধিকার আছে বলিয়া দাবী করিতেন।

পেশবা-যুগে কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল শ্রেণীর সর্দ্দারই স্বীয় জায়গীরের মধ্যে স্বাধীন রাজ-ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। পেশবাগণ সিন্ধিয়া, হোলকর, গাইকবার প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর সর্দ্দারেরও দেওয়ান প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের স্বাধীন ক্ষমতা বেশী ক্ষুণ্ণ হইত না। ইংরেজ সরকারের ইনাম কমিশন যখন মহারাষ্ট্রের সকল সর্দ্দারের সম্পত্তি ও বিবিধ প্রকারের অধিকার সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছিলেন, তখন যাধবরাও তাঁহাদিগকে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের বসতি-স্থান, মালেগাঁও-এর সর্ব্বপ্রকার শাসন আমরাই করিয়া আসিতেছি। ইহার উপর সরকারের কোন হাত নাই।" (রহন্যাচা গাঁব মালেগাঁব, ত্যাচী বহিবাট মুখত্যারীনেঁ আমচে আম্মী করত আহো ত্যাঁত সরকারচী দখলগিরী কাহীঁ এক নাহীঁ—পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ যাদী)। স্থপে-নিবাসী পবার বংশও নিজেদের জায়গীরের ভিতর অপ্রতিহত প্রভুত্ব করিতেন, পেশবাগণ তাহাতে কোন দিন হস্তক্ষেপ করেন নাই (পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ যাদী)। ইহার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু দুইটিই বোধ হয় যথেষ্ট।

এই সকল জায়গীরদারেরা ছিলেন য়ুরোপের মধ্যযুগের ব্যারণদিগের মত ছোট-ছোট রাজা। একেবারে স্বাধীন না হইলেও আপনাদের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, জীবনমরণের

বিধাতা। তাঁহাদিগের শাসন মোটের উপর স্বেচ্ছাতন্ত্রেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু যে সকল গ্রামের উপর তাঁহারা প্রভুত্ব করিতেন, সেগুলির শাসন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। মহারাষ্ট্রের প্রাচীর-ঘেরা ছোট-ছোট গ্রামগুলি ছিল ছোট ছোট এক একটি রাজ্য,—আর এই সকল রাষ্ট্রখণ্ডের মধ্যে স্বেচ্ছাতন্ত্রের কোন স্থান ছিল না। এই গ্রাম্য সমাজগুলির শাসনে যে সাম্যবাদের প্রভাব দেখিতে পাই, জগতের আর কোথাও তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। সেই অজ্ঞাত আদিম যুগে যখন এই গ্রামগুলির প্রথম পত্তন হইয়াছিল, তখন হইতে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে প্রজাতন্ত্র ব্যতীত অপর কোন শাসনতন্ত্রের প্রচলন হয় নাই।

মারাঠা-পল্লীর শাসন-কথা অন্যত্র আলোচনা করা যাইবে। এখানে আমরা মোটামুটি ভাবে সমগ্র মারাঠা-সাম্রাজ্যের শাসনতন্ত্রের আকার-প্রকার বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিব। মারাঠা-সাম্রাজ্যের নায়ক পেশবা, কারণ তিনি সাতারার ছত্রপতি মহারাজের প্রতিনিধি। সে হিসাবে পেশবা সামরিক জায়গীরদার (Feudal Barons) বা সর্দ্দারগণের প্রভু; আবার অন্য হিসাবে তিনি তাঁহাদেরই একজন। এই সকল জায়গীরদার যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে সৈন্য লইয়া পেশবার সাহায্য করিতেন; এবং তাহার বিনিময়ে জায়গীর বা "সরঞ্জাম" ভোগ করিতেন। নিজ নিজ জায়গীরের মধ্যে তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল; কিন্তু যে গ্রামগুলির উপর তাঁহারা প্রভুত্ব

পরিচালনা করিতেন তথায় আদিমকাল হইতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রাম্য প্রজাতন্ত্রের কর্ম্মচারীরা জায়গীরদারের কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে বহাল বা বরতরফ করিবার ক্ষমতা, জায়গীরদার ত দূরের কথা, পেশবারও ছিল না। সুতরাং মারাঠা-সাম্রাজ্যের শাসন-তন্ত্রে রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতির অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন একটি সংজ্ঞা দ্বারাই ইহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। ইহাকে রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র অথবা অভিজাততন্ত্র বলিতে অক্ষম হইয়া আইরিস লেখক টোন (W. H. Tone) ইহার নাম দিয়াছেন সামরিক গণতন্ত্র (Military Republic); কিন্তু সামরিক গণতন্ত্র বলিলেও ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা হয় না। সত্য বটে, মারাঠা-সাম্রাজ্যে অতি সাধারণ সৈনিকেরও প্রতিভাবলে প্রথম শ্রেণীর জায়গীরদারের উচ্চ সম্মান লাভ করা অসম্ভব ছিল না; কিন্তু তাহা জটিল মারাঠা শাসনতন্ত্রের একটি প্রকৃতি মাত্র। একটি প্রকৃতির বর্ণনায় সমগ্রের প্রকাশ কেমন করিয়া হইবে? মারাঠা সাম্রাজ্যের বা রাজ্য-সংঘের ভিত্তি আবার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল,—জাতীয় ঐক্যের উপর নহে। পেশবাগণ শিবাজীর জাতীয় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাই যখন মারাঠা সাম্রাজ্যের সহিত নবীন জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ইংরেজের সংঘর্ষ হইল, তখন মারাঠা সাম্রাজ্য জীর্ণ অট্টালিকার মত সামান্য আঘাতেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

গ্রাম্য-সমিতি

বাঙ্গালা দেশের শস্যশ্যামল সমতলের সহিত যেমন মহারাষ্ট্রের বন্ধুর পার্ব্বত্য উপত্যকার প্রাকৃতিক পার্থক্য আছে, তেমনই বাঙ্গালার সমতলবাসী কৃষকের ও পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত শ্বাপদসঙ্কুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মারাঠা পল্লীর অধিবাসিগণের মধ্যেও যথেষ্ট চরিত্রগত প্রভেদ আছে। বাঙ্গালী কৃষক নিরীহ, নির্ব্বিবাদে সকল উৎপীড়ন সহ্য করিয়া যায়; সাধ্য পক্ষে রাজা বা ভূস্বামীর সহিত বিরোধ করিতে চাহে না। পেশবাযুগের মারাঠা কৃষকেরও রাজভক্তির অভাব ছিল না; কিন্তু সেই রাজভক্তি কোন দিনই তাহাকে তাহার ন্যায্য অধিকারের প্রতি উদাসীন হইতে দেয় নাই। ব্যক্তিগত সম্মানবোধ তাহাদের মধ্যে বড়ই প্রবল ছিল; তাই, যে সমস্ত ইংরেজ কর্ম্মচারী উত্তর ভারত হইতে নববিজিত মহারাষ্ট্র শাসন করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা এই অর্দ্ধনগ্ন দরিদ্র পাহাড়ীদের নির্ভীক আচরণে একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ (Elphinstone) বলেন যে, "সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া মারাঠা কৃষক কোন দিনই দাঁড়াইয়া থাকা আবশ্যক বোধ করে নাই; অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহারা বসিয়া পড়িত।" পেশবাযুগেও তাহারা এইরূপ ব্যবহারেই অভ্যস্ত ছিল। উত্তরের মুসলমান দরবারের আদব-কায়দায় তাহাদের মেরুদণ্ড নত হয় নাই; তাই, সকল কাজেই তাহাদের চিরন্তন অধিকারের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া, তাহারা

জন্মভূমির উচ্চশৈলশৃঙ্গের মত সোজা হইয়াই চলিত। মারাঠা জাতির চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যই, স্বেচ্ছাতন্ত্রের নায়ক পেশবাদিগের ক্ষমতা কতকটা সংযত করিয়া রাখিয়াছিল।

রাষ্ট্রের ও সমাজের নেতা হিসাবে পেশবাগণ মধ্যযুগের য়ুরোপীয় নরপতিগণের অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী ছিলেন। রাষ্ট্রের নেতা য়ুরোপীয় রাজগণ সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না; যাজক-সম্রাট্ পোপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে প্রায়ই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু পেশবাগণ রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই নেতৃত্ব করিতেন। তথাপি মারাঠা-চরিত্রের দোষ-গুণের কথা ভাল করিয়া জানিতেন বলিয়াই, তাঁহারা প্রজাগণের কোন প্রাচীন অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। সে দুঃসাহস যাহার হইয়াছিল, তাহার সহিতই মারাঠা সাম্রাজ্য ও পেশবার প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পেশবাদিগের আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। প্রথম হইতেই তাঁহাদের জমার অঙ্ক অপেক্ষা খরচের অঙ্ক হইয়াছিল অনেক বেশী। সুতরাং বাণিজ্যের প্রসার দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা ব্যতীত তাঁহাদের আর্থিক অনটন ঘুচাইবার আর উপায় ছিল না। দূরদর্শী শিবাজী স্বদেশ-প্রেম-প্রণোদিত হইয়া যে বাণিজ্য-নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, পেশবাগণও প্রয়োজনের অনুরোধে সেই নীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। এই কারণেই মারাঠাগণ বিজিত রাজ্য শাসনকালে লুণ্ঠন-প্রিয়তার পরিচয় দেয় নাই। তখন তাহাদের লক্ষ্য থাকিত

রাজস্ব স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করার দিকে। এই সমস্ত কারণেই মারাঠা রাজনীতিজ্ঞেরা পুরাতন প্রথা, পুরাতন অধিকারের উপর বড় সহজে হস্তক্ষেপ করিতেন না, তাই মারাঠা-সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্বেও যেমন পল্লীসমিতিগুলি আপনাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপার স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে, মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতনের দিন পর্য্যন্তও তাহাদের স্বাধীন সত্তা তেমনই অব্যাহত রহিয়াছে।

এই পল্লী-সমিতিগুলি ছিল মারাঠা শাসনপদ্ধতির প্রাণস্বরূপ। ইহাদিগকেই ভিত্তি করিয়া পেশবাযুগের শাসন-তন্ত্র গঠিত হইয়াছিল। পেশবার কতকগুলি কর্ম্মচারী কখনও কখনও গ্রাম্য-সমিতির কোন কোন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই কর্ম্মচারিগণ পরিচালিত হইত পেশবার কারভারীর হুকুমে, আর তাঁহাদের কাজের হিসাব লইত হুজুরদপ্তর বা ইম্পিরিয়াল্ সেক্রেটারীয়েটের কর্ম্মচারীরা। সর্ব্বোপরি পেশবা, কারভারী ও হুজুরদপ্তর ; সর্ব্বনিম্নে অসংখ্য গ্রাম্য-সমিতি, আর এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগসেতু একদল কামাবিস্দার ও মাম্লতদার। মোটের উপর পেশবাযুগের শাসনতন্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি ইহা হইতেই অনুমান করা যাইবে। সুবিধার জন্য গ্রাম্য-সমিতি ও হুজুরদপ্তর সম্বন্ধে পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

এল্ফিন্ষ্টোন্ বলিয়াছেন,—"যে ভাবেই দক্ষিণের দেশীয় শাসনতন্ত্রের বিচার কর, ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে গ্রামবিভাগ। এই সমিতিগুলিতে অল্পের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের সকল উপাদানই থাকিত ; এবং অন্য সকল গভর্ণমেন্ট

তিরোহিত হইলেও ইহারা গ্রামবাসিগণকে রক্ষা করিতে পারিত।” আজ বাঙ্গালা দেশ হইতে পল্লীসমাজ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে বোধ হয় স্বাধীন, স্বতন্ত্র, আত্মনির্ভরশীল এক একটি পল্লী-সমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা সহজ হইবে না। কিন্তু এই সম্পর্কে আরও একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। মধ্যযুগে যখন উত্তর ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতে শোণিতসিক্ত, যখন উত্তর ভারতে স্বেচ্ছাতন্ত্রের শক্তি অপ্রতিহত, তখন দক্ষিণ-ভারতের পল্লী-সমিতি হইতে প্রজা-তন্ত্রের সাম্যবাদ তিরোহিত হয় নাই। গ্রামের পঞ্চায়েতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের আসন সমান। শূদ্রও যখন পঞ্চায়েতে বিচারকের আসন অধিকার করিত, তখন সে “পঞ্চ পরমেশ্বরের” অংশ, তখন সে বাদী প্রতিবাদীর পিতৃস্থানীয়। আলুতা ও বলুতাগণের মধ্যে কেহ কেহ অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য। কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা গ্রামের বলুতা,—তাহাদের সহি না থাকিলে গ্রামের সকল দলিল অসিদ্ধ। বিচারালয়ে তাহাদের সাক্ষ্যেরও যে মূল্য, ব্রাহ্মণ কুলকর্ণী, দেশমুখ ও দেশাইয়ের সাক্ষ্যেরও সেই মূল্য। খৃষ্টের কত শত বৎসর পূর্ব্বে এই পল্লী-সমাজের উৎপত্তি, কখন তাহাদের মধ্যে এই সাম্য-বাদের প্রচলন হইয়াছিল তাহা বলিবার উপায় নাই। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু-যুগেও যে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল, তাহার বহু প্রমাণ প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিতে, মুদ্রায়, সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে বিদ্যমান। (যাঁহারা এ বিষয় ভাল করিয়া জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রন্থ Corporate Life in Ancient India পাঠ করিতে অনুরোধ করি)।

মারাঠা গ্রামগুলি হয় পর্ব্বতশিখরে, না হয় পর্ব্বত-মূলে উপত্যকায় অবস্থিত। সেকালে পথ-ঘাটের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। দেশ অরাজক, সুতরাং বিপদে-আপদে এক গ্রামের লোক অন্য গ্রামের লোকের নিকট হইতে সাহায্যের আশা করিতে পারিত না। তাই প্রত্যেক গ্রাম এক একটি প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হইত। মারাঠীতে এই প্রাচীরের নাম 'গাঁওকুসু'। গ্রামের জমিগুলি দুইভাগে বিভক্ত। একভাগে সাদা জমি, এই জমির উপর গ্রামবাসীদের বাসভবন নির্ম্মিত হইত। আর অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর কালো জমিগুলি চাষ আবাদের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইত। সকল গ্রামবাসী পল্লী-প্রাচীরের ভিতর বাস করিতে পারিত না। রামোসী ও ভীল, বেডর প্রভৃতি কতকগুলি জাতি থাকিত প্রাচীরের বাহিরে ; কারণ, চৌর্য্যই তাহাদের কৌলিক বৃত্তি। গ্রামবাসি-গণের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য যাহাতে পাওয়া যায়, এই জন্য প্রত্যেক গ্রামেই কামার, কুমার, সূতার প্রভৃতি শিল্পী থাকিত। সাধারণতঃ গ্রামবাসীরাই গ্রামের মামলা-মোকর্দ্দমার বিচার করিত। আর প্রত্যেক গ্রামেই রাজস্ব আদায়, হিসাব রাখা, শান্তিরক্ষা করা, পঞ্চায়েত ডাকা ও গ্রামের ময়লা-আবর্জ্জনা পরিষ্কার করার জন্য কতকগুলি কর্ম্মচারী থাকিত। পেশবা-সরকার ইহাদিগকে নিয়োগ করিতে পারিতেন না ; কিন্তু গ্রামবাসীরাও এই সকল কর্ম্মের জন্য কাহাকেও নির্ব্বাচন

করিতে পারিত না। বোধ হয়, অতি প্রাচীনকালে নির্ব্বাচন-প্রথাই প্রচলিত ছিল; কিন্তু পেশবাযুগে এই প্রাচীন পদ্ধতি লোপ পাইয়াছিল। তখন গ্রাম্য-সমিতির প্রত্যেক কর্ম্মচারীর পদ তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত; এবং তাহার পুত্র-কন্যাগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতৃপদের অধিকারী হইত। তাহারা আবার ইচ্ছা করিলে, স্থাবর-অস্থাবর অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায়, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত পিতৃপদ বিক্রয় করিয়াও ফেলিতে পারিত।

মারাঠা-পল্লীর সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি পাটীল। রাজস্ব আদায়, পুলিশের বন্দোবস্ত এবং পঞ্চায়েত ডাকিবার ভার তাঁহার উপর। প্রয়োজন হইলে পাটীলই পেশবা-সরকারের নিকট গ্রামবাসিগণের অভাব-অভিযোগ জানাইতেন; আবার গ্রামে সরকারী হুকুম জাহির করিতেন। গ্রাম্য প্রজাতন্ত্রের ও পেশবা-সরকারের সহিত সংযোগ সাধিত হইত পাটীলের দ্বারা। গ্রামে তিনি পেশবার প্রতিনিধি, আর গ্রামের বাহিরে পেশবার কর্ম্মচারী কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দারের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার সময় তিনি গ্রাম্য-সমিতির ক্ষমতা-প্রাপ্ত মুখপাত্র। পেশবার কর্ম্মচারী যখন গ্রামের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিতেন, তখন তাঁহাকে পাটীলের মতামত গ্রহণ করিতে হইত। নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের মধ্যে আবার প্রত্যেক গ্রামবাসীর দেয় স্থির করিয়া দিতেন পাটীল। রাজস্বের পরিমাণ অতিরিক্ত বোধ হইলে, তিনি প্রতিবাদ করিতে পারিতেন, এবং সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিলে, তিনি গ্রাম পরিত্যাগ

করিয়া রাজস্ব আদায় একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। তখন বাধ্য হইয়া সরকারী কর্ম্মচারীকে নরম হইতে হইত। এখানে দুইখানি প্রাচীন দলিল হইতে ইহার দুইটি উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৭৭৩-৭৪ খৃঃ দ্বিতীয় মাধব রাওয়ের শাসনকালে ইন্দাপুর পরগণার কামাবিস্‌দার গোপালরাও ভগবন্তের নিকট প্রেরিত একখানি পত্রে লিখিত আছে—"অনাবৃষ্টিতে পরগণার রবি ও খরিপ শস্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, পাটীলগণ শস্যের অবস্থা তদন্ত করিয়া তদনুসারে খাজনার নূতন হার নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা (তাঁহাদের দাবী শুনাইবার জন্য) টেম্বুর্ণীতে (পরস্থলে) চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আনাইয়া, ক্ষেত পরিদর্শন করাইয়া, রাজস্ব আদায় করা উচিত বলিয়া তুমি পত্র লিখিয়াছ। তদনুসারে আজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে যে, শস্যের ব্যবস্থা তদন্ত করিয়া, রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবে।" (Peshwa's Diaries)। আর একখানি পত্রে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়,—"তালুক শিবনেরের জমিদার ও পাটীলগণ অসন্তুষ্ট হইয়া, স্থান ত্যাগ করিয়া আলে কসবায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের নিকট একজন কারকুন প্রেরিত হইয়াছিল,—তাহার নিকট তাহারা তাহাদের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এই সকল অভিযোগের তালিকা তুমি হুজুরে প্রেরণ করিয়াছ।" বলা বাহুল্য, শিবনেরের পাটীলগণের অভিযোগের প্রতিকার করা হইয়াছিল,—১৭৭৫ সালে শিবনেরের পাটীলগণ কামাবিস্‌দারকে, তথাকার জমিদারদিগের

প্রতিশ্রুত রাজস্বের নিমিত্ত জামিন গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল,—ইহারও দলিল-বদ্ধ প্রমাণ আছে। তবে একথা ঠিক যে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে, পাটীলগণ কখনও সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে এই চরম উপায় অবলম্বন করিতেন না। সাধারণতঃ তাঁহারা পেশবাকে আপনাদের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করিলেই তাহার প্রতিকার হইত।

গ্রামবাসিগণের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হইলে, পাটীল প্রথমে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করিতেন। আপোষ-মীমাংসা বা সালিশীতে কোন কাজ না হইলে, অগত্যা তিনি মোকর্দ্দমা সরকারী আদালতে না পাঠাইয়া পঞ্চায়েত ডাকিতেন (প্রতাপ-সিংহের য়াদী দেখুন)। বিচার বিভাগের কর্ম্মচারী হিসাবে তাঁহার কর্ত্তব্য এইখানেই শেষ। পুলিশের কর্ত্তা হিসাবে তাঁহাকে চুরি-ডাকাতির তদন্ত করিতে হইত। এই কার্য্যে গ্রামের বৃত্তিভোগী চৌকিদার তাঁহার সহকারিত্ব করিত।

পাটীল পেশবা-কর্ত্তৃক নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারী নহেন; সুতরাং সরকারী তহবিল হইতে তিনি বেতন পাইতেন না। গ্রামবাসীদিগের নির্ব্বাচিত নায়ক না হইলেও, পল্লীসমাজের সেবাতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত বলিয়া, পল্লীবাসিগণের প্রদত্ত বৃত্তি দ্বারাই তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হইত। এই বৃত্তির পরিমাণ ও পরিচয় পাওয়া যাইবে পেশবাযুগের একখানি ক্রয়-পত্র হইতে। এই ক্রয়-পত্রখানির অনুবাদ উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে পাটীলের বেতন সম্বন্ধীয় একটি প্রথার আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পাটীল ও গ্রাম্য সমিতির

অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ নিজ-নিজ পদ ও তাহার উত্তরাধিকার বিক্রয় করিতে পারিতেন। কিন্তু কখন কখন তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র বৃত্তি বিক্রয় করিয়া একেবারে নিঃসম্বল হওয়া অপেক্ষা, এক অংশ বিক্রয় করিয়া, অপর অংশ নিজের ও পুত্র-পৌত্রাদির জন্য রাখিয়া দেওয়া ভাল বিবেচনা করিতেন। এইরূপ বৃত্তির আংশিক বিক্রয়কালে পাটীল নিজের জন্য কতকগুলি বিশেষ অধিকারও রাখিয়া দিতেন। আবার কোন পাটীলের পাটীল-গিরি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভাগ হইয়া গেলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র কতকগুলি বিশেষ অধিকার পাইতেন। এই সকল অধিকারের মারাঠী নাম "বড়ীলপণ" বা "জ্যেষ্ঠ স্বত্ব"। পাটীলের বৃত্তির পরিমাণ, প্রকার ও বিক্রয়কালে উভয় পক্ষের মধ্যে তাহার বিভাগরীতির সম্যক্ পরিচয় নিম্নলিখিত দলিলখানি হইতে পাওয়া যাইবে।

১৬৫৬ শকে বিরোধীকৃত নাম সম্বৎসরে আশ্বিনের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন রবি বাসরে ঋণদায়গ্রস্ত বঙ্গোজী পাটীল ঋণশোধের নিমিত্ত আপনার পাটীলগিরির অর্দ্ধেক গোরখোজী নামক এক ব্যক্তিকে ৭৭৫১৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া একখানি দলিল লিখিয়া দেয়। ঐ দলিলে পাটীলগিরির "মান পান হক্ক" ও ঘরবাড়ী ক্ষেত বাগান নিম্নলিখিত ভাবে বিভাগ হইয়াছিল (Peshwa's Diaries, Vol. I. pp. 146—159)।

(১) পাটীলগিরি সম্বন্ধে নাম লিখিবার সময় আগে গোরখোজী পরে বঙ্গোজীর নাম লেখা হইবে। (২) সরকারী ভেট্ প্রথমে গোরখোজী ও পরে বঙ্গোজী দিবে। (৩) সরকারী

শিরোপা ও পান প্রথমে গোরখোজী ও পরে বঙ্গোজী পাইবে। (৪) পোলা উৎসবের সময় প্রথমে গোরখোজীর বলদ ও তৎপশ্চাতে বঙ্গোজীর বলদ গ্রাম্য তোরণের ভিতর দিয়া বাহির হইবে। (৫) মঙ্গ ও মহার প্রথমে গোরখোজীর গৃহে তোরণ বান্ধিবে ও গেরুয়া বা লাল রঙ্গ দিবে ও পরে বঙ্গোজীর গৃহে দিবে। (৬) দেওয়ালীর বাদ্য প্রথম গোরখোজীর গৃহে বাজাইবে, পরে বঙ্গোজীর গৃহে বাজাইবে। (৭) কোলী প্রথমে গোরখোজীর গৃহে পরে বঙ্গোজীর গৃহে জল দিবে। (৮) গোরখোজীর 'গণেশ' ও 'গৌর' প্রথমে মিছিল করিয়া বাদ্য বাজাইয়া দুর্গামাতার নিকট আসিবে; পরে বঙ্গোজীর 'গণেশ' ও 'গৌর' মিছিল ও বাদ্যসহ তথায় আসিবে। সেখান হইতে দুই মিছিল একত্র হইয়া প্রথমে গোরখোজীর ঠাকুর ও তৎপশ্চাতে বঙ্গোজীর ঠাকুর লইয়া যাইবে। (৯) কড়কণা* প্রথম গোরখোজী ও পরে বঙ্গোজী পাটীলের গৃহে দিবে। (১০) হোলী উৎসবে বঙ্গোজী পাটীল প্রথমে বাদ্য-সহকারে পুরী আনিয়া আগুনে দিবে। পরে গোরখোজীর পুরী আগুনে দিবে। (১১) দশরার সময় প্রত্যহ দশটি বাদ্য প্রথমে বঙ্গোজীর ও পরে গোরখোজীর ঘরে বাজিবে। গ্রামের মালী ও গুরব প্রথমে বঙ্গোজী ও পরে গোরখোজীর ঘরে ফুল ও বাবরী দিবে। (১২) দশরার সময়ে বঙ্গোজী প্রথমে ও তাহার পরে গোরখোজী আপ্‌টা গাছের

---

* নবমীর রাত্রে এবং অন্যান্য উৎসবের দিনে দেবমূর্ত্তির যাত্রার উপর গোল গোল কাগজের টুকরা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়, ইহাকে কড়কণা বলে।

পূজা করিবে। (১৩) বঙ্গোজীর শিরাল শেট* মূর্ত্তি প্রথমে বাজাইয়া আনিয়া রাখিবে। তারপর গোরখোজীর শিরাল শেট আনিয়া দুই মূর্ত্তি একত্র করিয়া প্রথমে বঙ্গোজীর ও তৎপশ্চাতে গোরখোজীর মূর্ত্তি লইয়া যাইবে। (১৪) গ্রাম হইতে প্রথমে বঙ্গোজীকে পান-তিলক দেওয়া হইবে। গোরখোজী তাহার পরে পাইবে। (১৫) ব্রাহ্মণ কার্ত্তিকী দ্বাদশীর আগের তুলসী পূজা প্রথমে বঙ্গোজীর ঘরে ও তৎপরে গোরখোজীর ঘরে করিবে। বঙ্গোজী পাটীল প্রথম কার্ত্তিকের শুক্ল প্রতিপদের দিন হরি জাগরণ করিবে, তৎপরে গোরখোজী পাটীল তাহার পরদিন করিবে। (১৬) মহার প্রথমে বঙ্গোজী পাটীলের ঘরে মৌলী (জ্বালানি কাঠ) দিবে, পরে গোরখোজী পাটীলের ঘরে দিবে। (১৭) উভয় পাটীলের সম্মতি লইয়া কুলকর্ণী দলিল পত্রের উপর লাঙ্গল চিহ্ন দিবে।

নিম্নলিখিত পাওনাগুলিতে উভয়ের সমান দাবী থাকিবে।

(১) শস্যের নৌকা প্রতি পাটীলের প্রাপ্য দেড়মণ শস্য (ইহাকে মারাঠীতে শেল পট্টি বলে)। (২) প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে পঁচিশ আঁটি জওয়ারের কাঠি। (৩) প্রত্যেক ক্ষেত্র প্রতি ৫/০ মণ কাপাস। (৪) প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে এক আঁটি জওয়ার। (৫) প্রত্যেক চামারের নিকট

* শিরাল শেট একজন বানিয়ার নাম। এই বণিক্ কেবল এক ঘণ্টার জন্য রাজা হইয়াছিল। শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন তাহার মৃন্ময়মূর্ত্তির পূজা হয়। পূজান্তে মহিলাগণ মূর্ত্তির চারিদিকে নৃত্য করেন। তাহার পর কূপোদকে ইহার বিসর্জ্জন হয়।

হইতে বার্ষিক একজোড়া জুতা। (৬) প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে এক আঁটি কাঁটা ঘাস। (৭) ঘানি প্রতি ৯ টাক তৈল (১ টাক=নয় মাস)। (৮) প্রত্যেক পানওয়ালার নিকট হইতে প্রতিদিন ১৩টী পান। (৯) জোশী ব্যতীত অপর সকলের ইক্ষুক্ষেত্র হইতে একদলা গুড়, এক আঁটি আক ও এক পাত্র রস। (১০) প্রত্যেক পাল হইতে দশরার দিন এক একটি হাঁস। (১১) প্রত্যেক তাঁত হইতে বার্ষিক এক একখানি কাপড়। (১২) ধাঙ্গড়ের তাঁত প্রতি এক একখানি কাপড়। (১৩) প্রত্যেক বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ ও বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হওয়া উপলক্ষে আধখানি করিয়া নারিকেল। (১৪) শব্জী-ওয়ালার নিকট হইতে শাক। (১৫) প্রত্যেক ক্ষেত হইতে ধান্য ব্যতীত অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের এক এক পাত্র (বাকা)। (১৬) প্রত্যেক দোকানদারের নিকট হইতে প্রথানুসারে প্রাপ্য অংশ। (১৭) প্রত্যেক বানিয়ার দোকানের খাজনা। (১৮) প্রত্যেক মুদির নিকট হইতে মসলার ছালা প্রতি একপোয়া। (১৯) লবণের দোকানের হাশীল। (২০) বাহে জমা প্রতি বর্ষ ২৫৲ টাকা। (২১) প্রত্যেক মুদির দোকান হইতে প্রতিদিন এক একটি সুপারি।

পাটীলবাড়ীর অর্দ্ধেক গোরখোজীর ও অর্দ্ধেক বঙ্গোজীর।

যদি হাকিম দেশপাণ্ডে ও দেশমুখের নিকট হইতে কোন ইনাম জমি পাওয়া যায়, তবে উভয়ের মধ্যে সমান বিভাগ হইবে।

সুন্টিবসাত ও শীকার উভয়ের মধ্যে সমান বিভাগ হইবে।

গোরখোজী তাহার অংশ প্রথমে লইবে, পরে বঙ্গোজী তাহার অংশ পাইবে।

যদি গ্রামের সন্নিকটে নূতন বাজার বা বসতি হয়, তাহার লভ্যাংশ এবং পাওনা উভয়ে সমান ভাবে বণ্টন করিয়া লইবে।

পাটীলদিগের গরু মরিলে মহার মৃতপশুর চর্ম্ম উভয়কেই দিবে।

প্রত্যেক পাটীল আপন আপন জ্ঞাতি ব্যতীত অপর সকলের নিকট হইতে পাওনা আদায় করিবে।

যে সমস্ত পুরাতন পাওনার কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পাওনা থাকিলে বঙ্গোজী ও গোরখোজীর মধ্যে সমান ভাগ হইবে।

এতদ্ব্যতীত পাটীলগণ তাঁহাদের কাজের জন্য নিষ্কর জমিও ভোগ করিতেন। ঐ নিষ্কর ইনাম জমির বিভাগের কথাও এই দলিলে আছে।

বলা বাহুল্য, এই দলিলখানিতে পাটীলের সমস্ত পাওনার তালিকা নিঃশেষিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের প্রথা অনুসারে, পাটীলগণের পাওনা কম-বেশী হইত। বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ উপলক্ষে কোন কোন গ্রামের পাটীল যথাক্রমে ॥০ ও ১৲ পাইতেন। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি দলিলে, "শ্রাবণ পট্টি" "শিমগা নাচপট্টি" এবং "করলা" প্রভৃতি অপর কতকগুলি পাওনার উল্লেখ আছে। উপরি-উদ্ধৃত দলিলেই লক্ষিত হইবে যে, দসরা, পোলা প্রভৃতি কতকগুলি সার্ব্বজনীন উৎসবের সময় পাটীলকে কতকটা সামাজিক সম্মান প্রদান

করা হইত। পাটীল মুসলমান হইলেও হোলীর আগুনে পুরী নিক্ষেপ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন না। আবার কোন কোন জায়গায় প্রত্যেক বিবাহেই পাটীলদের গৃহ হইতে একটি সধবা রমণীকে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। কোথাও কোথাও পাটীলকে পর্ব্ব উপলক্ষে বলুতাদিগের ভূরি ভোজনে তৃপ্ত করিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই প্রকারের ভোজ কেবল শিষ্টাচারের খাতিরে দেওয়া হইত না। পাটীলের পদ যেরূপ দায়িত্বপূর্ণ এবং গ্রাম্য সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহাকে মাঝে মাঝে বিপদে পড়িতে হইত, তাহার অনুপাতে তিনি যে সামাজিক সম্মান ভোগ করিতেন তাহা মোটেই অতিরিক্ত নহে। গ্রামের রাজস্ব যথাকালে আদায় না হইলে, পাটীলকেই দণ্ড ভোগ করিতে হইত। গ্রামের কেহ বিদ্রোহী হইলে, বা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহাকে নজরবন্দী করিবার দায়িত্ব পাটীলের স্কন্ধেই ন্যস্ত হইত। পেশবার শত্রুগণ যখন গ্রাম আক্রমণ করিয়া গ্রামবাসীদিগের নিকট নিষ্ক্রয় মূল্য আদায় করিতে চেষ্টা করিত, তখনও পাটীলের হাতেই দড়ি পড়িত। আবার কোন বিদেশীর দ্রব্য গ্রামের সীমানার মধ্যে অপহৃত হইলে তাহার উদ্ধার বা ক্ষতিপূরণের দায় পড়িত বেচারা পাটীলের ঘাড়ে। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ বলেন যে, কোন সম্ভ্রান্ত পরিব্রাজক গ্রামের ভিতর দিয়া গেলে, তাঁহার মোটবাহক জুটাইতে হইত পাটীলকে। গ্রামবাসিগণের জন্য যাঁহাকে এত কষ্ট সহিতে হইত তাঁহাকে যে তাহারা একটু সম্মান দেখাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পদমর্য্যাদায় পাটীলের পরেই কুলকর্ণীর স্থান। পাটীল সাধারণতঃ জাতিতে মারাঠা। কোন কোন গ্রামে মুসলমান পাটীলও ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ পাটীলের কথা প্রায় কোথাও পাওয়া যায় না। কুলকর্ণী ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন জাতীয় কুলকর্ণী ছিল না। গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা তাঁহার কার্য্য; এতদ্ব্যতীত, গ্রাম্য-সমিতির অন্য সকল প্রকারের দলিলও তিনি লিখিতেন ও রাখিতেন। এক কথায় গ্রামের দলিল-দস্তাবেজের দপ্তরখানার তিনিই লেখক ও রক্ষক। অতি প্রাচীন দলিল-পত্রে কুলকর্ণীকে কখন কখনও গ্রাম-লেখক বলা হইয়াছে। দলিল ও হিসাব লিখিয়াই কিন্তু কুলকর্ণীর দায়িত্ব শেষ হইত না। রাজস্ব আদায় না হইলে, অথবা, যথাসময়ে পেশবার কর্ম্মচারীর নিকট না পৌঁছিলে, পাটীলের সঙ্গে কুলকর্ণীকেও দণ্ড ভোগ করিতে হইত। খুলদাদন পরগণার অন্তর্গত কিনর্গাও মৌজার পাটীল ও কুলকর্ণী দেয় রাজস্বের মধ্যে ১৯২৫৲ টাকা আদায় করিতে না পারায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন; বাকী রাজস্বের মধ্যে ১৬০০৲ টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের কারামুক্তি হয় নাই। পেশবা-সরকার অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে বাকী ৩২৫৲ টাকা মাফ করিয়াছিলেন (Peshwas' Diaries দেখুন)। রাজনৈতিক অশান্তির সময়েও পাটীলের সঙ্গে সঙ্গে কুলকর্ণীকে তাঁহাদের এলাকার প্রজাগণের ব্যবহারের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইত। পেশবা দ্বিতীয় মাধবরাও, নরসিঙ্গরাও জনার্দ্দনকে লিখিয়াছিলেন যে—"তোমার অধীন তালুকে আরও শিলেদার

থাকিলে, তাহাদের গ্রামের পাটীল ও কুলকর্ণীর নিকট হইতে জামিন লইবে,—যেন তাহারা বিদ্রোহী সর্দ্দারদিগের সঙ্গে যোগ দিতে না পারে।" (ব আণখী শিলেদার তুমচে তালুক্যাত রাহত অসতীল ত্যানী ফিতুরী সরদারাকড়ে চাকরীস্ জাউ নয়ে যে বিশী ত্যাস গাঁবচে পাটীল কুলকর্ণী জামীন ঘেনে—Peshwas' Diaries—Sawai Madhava Rao)

দায়িত্ব প্রায় সমান হইলেও কুলকর্ণীর "মান পান ও হক্ক" পাটীলের চেয়ে অনেক কম।

এই "মান পান হক্কের" তালিকা জুন্নর-সরকারের অন্তর্গত নিম্বগাঁও ও নাগা গ্রামের অর্দ্ধেক কুলকর্ণী ও জ্যোতিষী বতনের মালিক রঘুনাথের বিধবা মহালশাবাঈ-সম্পাদিত ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের একখানি বিক্রয়-পত্রে পাওয়া যাইবে। মহালশাবাঈর পুত্র অথবা পতিকুলের কোন নিকট আত্মীয় ছিল না। পতির পরিত্যক্ত ঋণ পরিশোধ ও দানধ্যান করিয়া পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত তিনি আপন সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ ২০০০৲ টাকা মূল্যে জুন্নরনিবাসী বাজী যশবন্ত ও গঙ্গাধর যশবন্ত চন্দ্রচূড়ের নিকট বিক্রয় করিয়া, তাহাদিগকে যথারীতি বিক্রয়-পত্র লিখিয়া দেন। এই বিক্রয়-পত্রে কুলকর্ণীর "মান পান হক্কের" নিম্নলিখিত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। (মূল দলিলের জন্য Peshwas' Diaries, Vol. I দেখুন।)

১। সরকারী শিরোপা পাটীলের পরে কুলকর্ণী পাইবে।

২। দীপালী ও দসরা উৎসব উপলক্ষে পাটীলের বাড়ীতে বাজনা হইবার পরে কুলকর্ণীর বাড়ীতে বাজনা হইবে।

৩। প্রত্যেক তৈলিকের দোকান হইতে প্রত্যহ ৯ টাঁক তৈল কুলকর্ণীর পাওনা।

৪। পাটীলের পরে শাকের দোকান হইতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী শাকের ভাগ কুলকর্ণী পাইবে।

৫। প্রত্যেক চামারের নিকট হইতে প্রতি বৎসর এক জোড়া জুতা।

৬। পাটীলের বাড়ীতে জল দিবার পর কোলী কুলকর্ণীর বাড়ীতে জল জোগাইবে।

৭। প্রত্যেক উৎসব উপলক্ষে এক-এক বোঝা জ্বালানি কাষ্ঠ।

৮। গ্রামের লোকেরা কালি তৈয়ার করিবার জন্য তৈল ও দপ্তর বাঁধিবার জন্য একখণ্ড কাপড় দিবে।

৯। পানের দোকান হইতে পাটীলের প্রাপ্য পানের অর্দ্ধেক পান। এতদ্ব্যতীত গ্রাম্য দেবতা শ্রীমার্ত্তণ্ডের মন্দির হইতে

১০। পূর্ণিমা মেলার সময় ২৮০ টঙ্কা।

১১। পাটীলের পরে প্রসাদ।

১২। আশ্বিন মাসের এক রবিবার পাটীলের ধূপ লওয়া হইলে কুলকর্ণী মন্দির হইতে ধূপ পাইবেন।

১৩। আশ্বিন পূর্ণিমার মেলার সময় পাটীল যে পরিমাণ মিঠাই লইবেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ মিঠাই কুলকর্ণী লইবেন।

এতদ্ব্যতীত মহালশাবাঈ মোশাহিরা বাবদ নগদ ২৪৲ ও ৩ খণ্ডি শস্য পাইতেন (১ খণ্ডি=২০ মণ)।

কুলকর্ণীর সহকারী চৌগুলা। চৌগুলা দলিল দস্তাবেজ রক্ষা বিষয়ে কুলকর্ণীকে সাহায্য করিতেন; আবার রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে পাটীলের সহযোগিতা করিতেন। পরলোকগত অধ্যাপক হরিগোবিন্দ লীময়ের নিকট শুনিয়াছি: মহারাষ্ট্রে একটি প্রবাদ আছে যে, পাটীলের জারজ পুত্র অথবা পাটীলের কোন পূর্ব্বপুরুষের জারজ পুত্রের বংশধর চৌগুলার পদ পাইতেন। মহারাষ্ট্র দেশে অব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জারজ পুত্র অন্য সন্তান অবর্ত্তমানে পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইত না। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাদজী সিন্ধিয়া তাঁহার পিতা রণোজীর জারজ পুত্র ছিলেন। কসবা মুকীব নিবাসী শাহাজী পাটীলের মৃত্যুর পর তাঁহার জারজ পুত্র শান্তাজী ঠাকুরই পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

গ্রাম্য-সমিতির কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে পদ-মর্য্যাদায় ও জাতিহিসাবে মহারের স্থান সকলের নীচে। কিন্তু গ্রামের মঙ্গলজনক সকল কাজেই মহারের সাহায্যের প্রয়োজন হইত। রাজস্ব আদায়ের সময়ে সকল গ্রামবাসীকে মহারই ডাকিয়া আনিয়া পাটীলের নিকটে গ্রামের "চবড়ী" ঘরে হাজির করিত। রাত্রিতে গ্রামের পথে-পথে ঘুরিয়া পাহারা দিয়া মহারই অসতর্ক গ্রামবাসিগণের সম্পত্তি তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিত। গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সমস্ত আবর্জ্জনা মহারই পরিষ্কার করিত। এই কার্য্যের জন্য গ্রামের সমস্ত মৃত পশুর চর্ম্ম

মহারের পাওনা ছিল। স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর অনুমান করেন যে, এই শেষোক্ত কৌলিক বৃত্তি হইতে মহার নামের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার মতে 'মহার' সংস্কৃত 'মৃতহরের' অপভ্রংশ। ত্রিম্বকনারায়ণ আত্রে বলেন যে, সংস্কৃত 'মা' ও 'হর' শব্দের যোগে মহার হইয়াছে। 'মা' শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। হিন্দুরা গরুকে লক্ষ্মী বলেন। সুতরাং 'মা' শব্দটি গো অর্থেও প্রযোজ্য। মহারেরা মৃত গরুর চর্ম্ম গ্রহণ করে, সুতরাং তাঁহারা 'মা-হর' অথবা মহার। মোলস্ওয়ার্থ সাহেবের মতে মহারেরাই মহারাষ্ট্রদেশের আদিম অধিবাসী এবং মহারের দেশ বা রাষ্ট্র বলিয়া এই প্রদেশের নাম মহার-রাষ্ট্র বা মহারাষ্ট্র হইয়াছে।

পাটীল ও কুলকর্ণীর মান পান হক্কের তালিকা আমরা দুইখানি বিক্রয়-পত্রে পাইয়াছি। মহারের মান পান হক্কের তালিকা-সম্বলিত কোন বিক্রয়-পত্র এ পর্য্যন্ত আমাদের হাতে পড়ে নাই। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পারণের পরগণার অন্তর্গত ইস্লক গ্রামের মহার ও মঙ্গদিগের মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন অধিকার লইয়া একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা হয়। এই মামলার 'সারাংশ' বা সংক্ষিপ্ত বিবরণে বাদী দেবনাক প্রদত্ত মহারদিগের প্রাচীন অধিকারের নিম্নলিখিত তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

১। লাঙ্গলের বলদ ব্যতীত অপর সকল মৃত পশুর চর্ম্ম তাহাদিগের প্রাপ্য।

২। দসরার দিন 'মঙ্গে'রা* প্রত্যেক গৃহ হইতে এক

---

* মঙ্গেরাও মৃত পশুর চর্ম্ম সংগ্রহ করিত। তাহাদের কৌলিক বৃত্তি কতকটা চর্ম্মকারের বৃত্তির ন্যায়।

একখানি নৈবেদ্য পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে পাঁচখানি নৈবেদ্য ও পাঁচটি পয়সা মহারের প্রাপ্য।

৩। পোলা উৎসবের বৃষভের নৈবেদ্য মহারের প্রাপ্য।

৪। মঙ্গদিগের গৃহের মৃত পশুও মহারের প্রাপ্য।

৫। দসরার দিন বলির মহিষের গলায় এক ঠোঙ্গা মিঠাই বাঁধিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করান হয়। ঐ মহিষ ও মিঠাই মহারের প্রাপ্য। মঙ্গেরা অন্যায় করিয়া ঐ মিঠাইর অংশ দাবী করে।

৬। 'জরী মরী'র (কলেরার দেবী) নৈবেদ্য মহারের প্রাপ্য।

৭। প্রাচীন প্রথা-অনুসারে মহারদিগের বর অশ্ব-পৃষ্ঠে চড়িয়া ও মঙ্গদিগের বর বৃষে আরোহণ করিয়া আসিবে। কিন্তু মঙ্গেরা এই প্রথার অন্যথা করিয়া তাহাদের বর অশ্ব-পৃষ্ঠে আনয়ন করিতেছে।

হয়ত মহারদিগের আরও অনেক অধিকার, আরও অনেক পাওনা ছিল। কেবল যে কয়টি অধিকার লইয়া বিবাদ হইয়াছিল, মামলার সারাংশে সেই কয়েকটিরই উল্লেখ করা হইয়াছে; বাকীগুলি স্বভাবতঃই বাদ পড়িয়াছে। গ্রামের বলুতা হিসাবে মহারও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মঙ্গের ন্যায় নিশ্চয়ই ফসল উঠিলে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতেই কিছু-কিছু শস্য পাইত।

গ্রাম্য-সমিতির পঞ্চম কর্ম্মচারী পোতদার। ইহার কার্য্য রাজস্ব আদায়ের সময় মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করা। সেকালে

কোন মুদ্রারই নির্দ্দিষ্ট মূল্য ছিল না—প্রত্যেক মুদ্রারই ওজন ও ধাতুর উৎকর্ষ অনুসারে দাম হিসাব করা যাইত। পোতদার জাতিতে সোণার; সুতরাং মুদ্রা-পরীক্ষায় তাহাদের কৌলিক পারদর্শিতা থাকিত। অনেক সময়ে কিন্তু একই ব্যক্তি বিভিন্ন গ্রামের পোতদারের কার্য্য করিত। ১৭৪০ সালের একখানি দলিলে লিখিত আছে যে, বালাজী রুদ্র, কেসো রুদ্র ও মোরো রুদ্র শেনবৈ নামক তিন ভ্রাতা* একটি সমগ্র তরফের পোতদারী করিতেন। এক-একটি তরফের অধীন চারি-পাঁচটি বা ততোধিক গ্রাম থাকিত। (কিত্তা পত্রে চিটনিশী বালাজী রুদ্র ব কেসোরুদ্র ব মোরোরুদ্র শেনবৈ পোতদার তর্ফ রাজাপুর যানী হুজুর শাহুনগর নজীক কিল্লে সাতারচে মুক্কামী স্বামী সনিধ য়েউন বিনন্তী কেলী কী তর্ফ মজকুরচে পোতদারীচে বতন আপলে আপণ উপযোগ করীত আসা)। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের একখানি দলিলে দৃষ্ট হয় যে, ঘনশেট সোণার নামক এক ব্যক্তি সাকসে ও কর্ণালে নামক দুই-দুইটি বিভিন্ন পরগণার পোতদারী করিত; এবং এই কার্য্যের জন্য আদায়ী রাজস্বের প্রতি টাকায় এক দামরী হিসাবে পারিশ্রমিক পাইত (৪ দামরী=১ পয়সা)।

এই কয়েকখানি দলিল হইতেই সপ্রমাণ হইবে যে, পোতদারের কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন ছিল না। ভিন্ন-ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন-ভিন্ন পরগণায় তাহাদিগের পারিশ্রমিক বিভিন্ন

* ইঁহারা ব্রাহ্মণ

হারে দেওয়া হইত। ইহার আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ১৭৬৫ সালের একখানি দলিলে দেখা যায় যে, নেবাসে পরগণার পোতদার লক্ষ্মণ সোণার সরকারী তহবিল হইতে মাসিক ৪৲ বেতন পাইতেন এবং প্রত্যেক বড় গ্রাম হইতে ২৲ ও প্রত্যেক ছোট গ্রাম হইতে ১৲ হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন। বোধ হয় পোতদারের কার্য্য পেশবা সরকারেরই বেশী উপকার সাধন করিত বলিয়া এই সরকারী বেতনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

গ্রাম্য-সমিতির কর্ম্মচারিগণের তালিকা এইখানেই শেষ হইল।

কেবল পাটীল, কুলকর্ণী, চৌগুলা, মহার ও পোতদার লইয়া গ্রামের কাজ চলে না। পেশবা সরকারকে প্রতি বৎসর রাজস্ব দেওয়া যেমন দরকার, গ্রামের শান্তিরক্ষা যেমন দরকার, পল্লীসংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ পল্লীবাসীর জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহও অত্যন্ত দরকার। অথচ মহারাষ্ট্রের পল্লীগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন,—শত্রু-ভয়ে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। আর পথঘাট এখনকার মত নিরাপদ ত নয়ই, সুগমও ছিল না। তাই প্রত্যেক গ্রামেই কতকগুলি শিল্পী থাকিত, ইহাদের সাধারণ নাম বলুতা। বলুতারা সংখ্যায় বারো,—মহার, সুতার, লোহার, চাম্ভার, পরীট বা রজক, কুম্ভার, হ্বাবী বা নাপিত, মঙ্গ, কুলকুর্ণী, জোশী, গুরব ও পোতদার। মহারের পাওনা সম্পর্কে আমরা

ইতঃপূর্ব্বেই একবার মঙ্গের পরিচয় পাইয়াছি। তাহাদের কৌলিক বৃত্তি কতকটা মহারের ও চর্ম্মকারের অনুরূপ। কুলকর্ণী গ্রাম্য-সমাজের আয়-ব্যয় রাখিত; আবার সময়ে সময়ে দরকার হইলে গ্রামবাসিগণের দলিল-দস্তাবেজও লিখিয়া দিত। এইজন্য বলুতা শ্রেণীতে তাহারও স্থান হইয়াছে। জোশী সংস্কৃত জ্যোতিষীর অপভ্রংশ। প্রত্যেক গ্রামেই একজন বা ততোধিক জোশী থাকা আবশ্যক, তাহা না হইলে পঞ্চাঙ্গ বা পাঁজি দেখিয়াই বা দেয় কে, আর স্বপ্নের ব্যাখ্যা—সুলক্ষণ বা অলক্ষণ নির্ণয়, শুভাশুভ মুহূর্ত্তই বা ঠিক করিয়া দেয় কে? শিবাজী মহারাজ পর্য্যন্ত জোশীদিগকে খুব সম্মান করিতেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা অনেক জোশীকে ভবিষ্যৎ গণনার জন্য বহু জমি ইনাম দিয়া গিয়াছেন। অনেক সময়ে একই ব্যক্তি কুলকর্ণী ও জোশীর কার্য্য করিত। কুলকর্ণী বতনের "মান পান হক্কের" তালিকা আমরা বিধবা মহালশাবাঈর বিক্রয়-পত্রে পাইয়াছি। জোশী বতনের পাওনার একটা তালিকাও ঐ দলিলখানিতেই পাওয়া যায়; কারণ, মহালশা বাঈর পরলোকগত স্বামী ছিলেন তাঁহার গ্রামের অর্দ্ধ জোশী বতনের মালিক। নিম্বগাঁওর জোশী গুরবের সমান 'বলুতা' পাইতেন, গ্রাম্য-দেবমন্দির হইতে প্রথম শ্রেণীর বলুতার সমান প্রসাদ পাইতেন আর পাইতেন ২৫ বিঘা ইনাম জমি। আমরা দেখিয়াছি যে পাটীলের পুত্র-সন্তান না থাকিলে, তাহার জারজ-সন্তানেরাও পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইত। জোশীদিগের বেলায় কিন্তু এ নিয়ম

খাটিত না। মহাভট নামক এক ব্যক্তি তাহার খুল্লতাতের জারজ পুত্র সুভানা দাসী-পুত্রের বিরুদ্ধে জোশী বতন সম্বন্ধে যে মামলা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। গুরব পল্লী-দেবমন্দিরের সেবক। প্রত্যেক পল্লীতেই এক-একটি মন্দির থাকিত ; সুতরাং দেবমন্দিরের কার্য্য পরিচালনার জন্য গুরবেরও প্রয়োজন। মহার, সুতার, লোহার, চামার, কুমার, রজক ও ক্ষৌরকারের কথা বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক।

প্রত্যেক গ্রামেই আবার বারোজন 'বলুতা'র সঙ্গে-সঙ্গে তেরোজন করিয়া 'আলুতা' থাকিত। 'বলুতা' ও 'আলুতা'দিগের অপর নাম 'কারু' ও 'নারু'। বোধ হয় প্রাচীনকালেও মহারাষ্ট্রের পল্লীগুলিতে আলুতা ও বলুতা ছিল। পণ্ডিত-প্রবর ফ্লিট সম্পাদিত, কানারিজ ভাষায় লিখিত যাদব রাজগণের একখানি প্রাচীন উৎকীর্ণ লিপিতে গ্রাম্যশিল্পিগণের (কারু কাইনাদির) পাওনার উল্লেখ দেখা যায়।* সুতরাং ইহাদিগের কারু নামই প্রাচীন ও বলুতা নাম আধুনিক। প্রতি বৎসরই ফসলের সময় ইহারা প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে কিছু শস্য পাইত। এই 'পাওনা'র সাধারণ নাম 'বলুতা' ও গ্রাম্য-শিল্পীরা 'বলুতা' পাইত বলিয়া প্রথমে 'বলুতাদার' ও পরে 'বলুতা' বলিয়া অভিহিত হইত।

বার্ষিক শস্য-প্রাপ্তিই বলুতাদিগের বাস-গ্রামের প্রতি একমাত্র আকর্ষণ নহে। গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে এই শস্য

---

* J. B. Br. R. A. S., vol. xii, p. 49.

দিত তাহাদিগের কার্য্যের বিনিময়ে। ধোপা নাপিত প্রভৃতি বলুতা না হইলে তাহাদের চলে না; তাই তাহাদের এই পারিশ্রমিক। বলুতা গ্রাম্য-সমাজের অনুগ্রহ-প্রদত্ত দান নহে। সুতরাং বলুতাদারগণ যাহাতে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র না চলিয়া যায়, সে দিকে গ্রামবাসিগণকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। বলুতাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট হইলে তাহারা চলিয়া যাইবে; এইজন্য গ্রামে কোন নবাগত শিল্পীকে তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া হইত না। ফলে, প্রত্যেক বলুতার নিজ-নিজ গ্রামে নিজ নিজ ব্যবসায়ে বংশানুক্রমিক একাধিকার জন্মিত। এই অধিকার তাহারা সহজে বা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিত না। কোন কারণে কোন বলুতা বা আলুতা গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে তাহার বংশধরগণ ৩০।৪০ এমন কি ৬০ বৎসর অনুপস্থিতির পরেও গ্রামে আসিয়া পিতা বা পিতামহের ত্যক্ত স্বত্বে দাবী করিত; এবং তাহাদের সে দাবী কখনও অগ্রাহ্য হইত না। এই প্রকার বিবাদের সময় গ্রামবৃদ্ধগণ গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ও বলুতাদারগণের বংশাবলী সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিত, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রঘোজী ও সটবাজী খণ্ডকে নামক দুই ব্যক্তি কসবা পুণার ক্ষৌরকার বতন দাবী করিয়া সনদ প্রার্থনা করে। তাহাদের আবেদনে লিখিত আছে যে, দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কসবা ত্যাগ করার পর অন্য একজন ক্ষৌরকার গ্রামবাসিগণের সেবা করে। মূল বতনদারদের বংশধরেরা পূর্ব্বপুরুষের গ্রামে

ফিরিয়া আসিলে, উভয় পরিবারের মধ্যে বতন সমভাগে বিভক্ত হয়। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নেবাসে পরগণার অন্তঃপাতী চিঞ্চোড়ি গ্রামের হ্বাবী বতনে জঘোজী ও যমাজী নামক দুই ভ্রাতা দুই পুরুষ কাল অনুপস্থিতির পর আপনাদের স্বত্ব সাব্যস্ত করে। তাহাদের পিতামহ দুর্ভিক্ষের সময় চিঞ্চোড়ি ছাড়িয়া গিয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী, বিসাজী, দারকোজী ও নিম্বাজী নামক চারি ভ্রাতা জুন্নর প্রান্তের অন্তর্গত কহডাড গ্রামের লৌহকার বতন দাবী করে। তাহাদের পিতৃব্য সন্তাজী পল্লীবাসিগণের উপর রাগ করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও ফিরিয়া আসে নাই; তথাপি পল্লী দরবারে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণের দাবী অগ্রাহ্য হয় নাই। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লোনিখণ্ড গ্রামের স্বর্ণকার বতনও মূল বতনদারের বংশধরদিগকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর পুনর্ব্বার দেওয়া হয়। এইরূপ পাটীল, কুলকর্ণী, মহার, পোতদার, চৌগুলা প্রভৃতি পল্লী-সেবকগণের বংশধরেরাও দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পরেও পূর্ব্বপুরুষের বতন দাবী করিতে পারিত।

পাটীল প্রভৃতি কর্ম্মচারী, ও বলুতা-আলুতার সমবায়ে গঠিত মহারাষ্ট্রের পল্লী-সমাজগুলি যে সর্ব্বপ্রকারেই এক-একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র, তাহা আমরা এতক্ষণে দেখিতে পাইলাম। কোন কারণেই কোন পল্লী-সমাজকে অপর কোন পল্লী-সমাজের দ্বারস্থ হইতে হইত না। তাহাদের যাবতীয় অভাব মোচনের উপায় তাহাদিগের নিজের হাতেই ছিল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ

ও চৌর্য্য নিবারণ পর্য্যন্ত শাসন সম্পর্কীয় কার্য্য পল্লী-সমাজের কর্ম্মচারীরা করিত; আর মন্দির-সংস্কার, ভূমি-কর্ষণ ও গৃহ-নির্ম্মাণের যাবতীয় উপাদান গ্রামের ভিতরেই গ্রামবাসিগণের আলুতা-বলুতাগণের সমবেত চেষ্টায় উৎপন্ন হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের শাদা জমির উপর ঘর-বাড়ী তৈয়ারি হইত; আর কাল জমি চাষ করা হইত। এই প্রথা হইতেই মারাঠী পণ্ঢরী শব্দটি দলিল-পত্রে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইত। পণ্ঢরী মানে শাদা; সুতরাং দলিলদস্তাবেজে পণ্ঢরী শব্দের অর্থ ছিল—শাদা জমির বা গ্রামের অধিবাসী, আর—কালী পণ্ঢরী মানে গ্রামবাসী ও গ্রামের জমির চাষী। সমস্ত গ্রামবাসী কিন্তু গ্রাম্য-প্রাচীরের ভিতরে বাস করিতে পাইত না। রামোশী ও ভীলদিগের কৌলিক বৃত্তি চুরি-ডাকাতি বলিয়া, ইহারা প্রাচীরের বাহিরে বাস করিত। বোধ হয় ইহারা বাড়ীর কাছে সকল রকম আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল জড়ো করিয়া রাখে বলিয়া, স্বাস্থ্যনীতির অনুরোধেও ইহাদিগের বাসস্থান পল্লী-প্রাচীরের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট হইত। আগেই বলিয়াছি, গ্রাম্য-পুলিসের কাজ এই চৌর্য্য-ব্যবসায়ী ভীল রামোশীদিগকেই করিতে হইত। ইহাদের এক-একজন 'নায়ক' বা বাঙ্গালাদেশের ধোপা-নাপিত সমাজের ভাষায় মণ্ডল থাকিত। গ্রামে কোন চুরি হইলে, তাহার দায়িত্ব, পড়িত ভীল ও রামোশীদিগের স্কন্ধে। যদি ইহারা চোর ধরিয়া দিতে বা চুরির মাল বাহির করিয়া দিতে না পারিত, তবে ইহাদের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্যের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইত।

যদি গ্রামের রামোশী বা ভীল চোরদের পায়ের দাগ বা অপর কোন চিহ্ন অন্য গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত অনুসরণ করিতে পারিত, তবে তাহারা ক্ষতিপূরণের দায় হইতে অব্যাহতি পাইত; আর চোর ধরিবার বা চোরাই মাল বাহির করিবার ভার পড়িত সেই গ্রামের রামোশীদের উপর। এই প্রথাটি ভারতবর্ষের পল্লীতে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল। এমন কি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বৌধায়ন ও নারদ সংহিতার মত প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরলোকগত অধ্যাপক হরিগোবিন্দ লীময়ের নিকট শুনিয়াছি যে, রামোশীরা কখনও নিজের গ্রামে চুরি করিত না। ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক দূর চলিয়া যাইতে পারিত; অথচ, বাঙ্গালাদেশের ডাকাতদের মত ইহাদের রণপা বা অন্য কিছুর দরকার হইত না। কখন কখনও রামোশীরা ২০।২৫ মাইল দূরের কোন গ্রামে চুরি করিয়া আবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিত। চুরি করিবার সকল রকম ফন্দি প্রত্যেক রামোশীরই ভাল করিয়া জানা থাকিত বলিয়া রামোশীরাই সহজে চোরাই মাল বাহির করিতে ও চোর ধরিয়া দিতে পারিত। প্রাচীনকালে কিন্তু অপহৃত দ্রব্যের জন্য ক্ষতিপূরণ করিতে হইত রাজাকে অথবা গ্রামণী বা পল্লী-সমাজের প্রধানকে। মারাঠা যুগে এই দায়িত্ব বেচারা রামোশীর কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহার স্বভাবের দোষে।

মারাঠা পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ মিরাসদার বা মিরাসী ও উপরি। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক,

গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজনা বাকী না ফেলিলে কাহারও ক্ষমতা ছিল না যে তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজনার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর স্বত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ৩০।৪০, এমন কি ৬০ বৎসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। বতন-দারেরা যেমন নিজেদের বতন বিক্রয় করিতে পারিত, মিরাসীরও সেইরূপ নিজ-নিজ মিরাসজমি দান-বিক্রয়ের অধিকার ছিল। উপরিরা অন্য গ্রামের লোক—দুইচারি বৎসরের জন্য সরকারী জমি অল্প জমায় বন্দোবস্ত করিয়া লইত। মেয়াদ ফুরাইলে আর সে জমিতে তাহাদের কোন দাবী থাকিত না। মিরাসীদের খাজনার হার ছিল উপরিদের চেয়ে অনেক বেশী। আবার অন্য প্রকারের দায়িত্বও তাহাদের নিতান্ত কম ছিল না। কোন মিরাসীর খাজনা বাকী পড়িলে, তাহা সকল মিরাসীকে মিলিয়া পরিশোধ করিতে হইত। গ্রাম্য-সমাজের বিবিধ প্রকারের ব্যয়ভারের অধিকাংশ তাহাদিগকেই বহন করিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন, পূর্ব্বে মারাঠা পল্লীতে মোটেই উপরি চাষী ছিল না। মিরাসীরা গ্রাম-প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই গ্রাম্য-জমির মালিকী স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কালক্রমে কোন-কোন মিরাসী পৈতৃক সম্পত্তি হারাইলে, তাহাদের জমি উপরিদিগের নিকট পত্তনি করা হয়। এই অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নহে।

এখনও মারাঠা কৃষকদিগের মধ্যে উপরি অপেক্ষা মিরাসীদিগের সংখ্যা অনেক বেশী।

পল্লী-সমাজের কর্ম্মচারী, আলুতা, বলুতা, রামোশী ও ভীল, মিরাসী ও উপরির কথার আলোচনা করা হইয়াছে; এইবার মারাঠা পল্লীর রাজস্বের কথার আলোচনা করা যাউক। অবশ্য পেশবা সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রাম্য-সমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার পেশবা সরকারের কর্ম্মচারিগণ পাটীলের সঙ্গে একত্র হইয়া, গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন। কিন্তু সরকারী খাজনা ছাড়াও প্রত্যেক গ্রামের কতকগুলি ছোট-বড় খরচ ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই এক-একটি দেব-মন্দির থাকিত। সেই মন্দির সংস্কারের জন্য ও মন্দিরের ঠাকুরের পূজার জন্য খরচের প্রয়োজন হইত। গ্রাম্য-সমিতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে দক্ষিণা দিতেন, বৃত্তি দিতেন, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতেন; প্রতি বৎসর নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করিতেন। ইহার প্রত্যেক কার্য্যের জন্যই টাকা পয়সার দরকার হইত। এই টাকা গ্রামবাসিগণের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তোলা হইত। এই সকল খরচ বার্ষিক ব্যাপার, প্রত্যেক বৎসরই করিতে হইত। বার্ষিক খরচের জন্য নির্দ্দিষ্ট ট্যাক্সের নাম 'সালাবাদ'। এতদ্ব্যতীত অনেক আকস্মিক ব্যয়ও গ্রাম্য-সমিতিকে করিতে হইত। মনে করুন, গ্রামের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল; সর্ব্বদা শত্রু-ভয়; প্রাচীর সংস্কার আর না করিলে চলে না। এমন অবস্থায় অবশ্য পেশবা সরকার

কখনও কখনও যে রাজভাণ্ডার হইতে গ্রাম্য-সমিতিকে সাহায্য না করিতেন এমন নহে। কিন্তু সকল সময়ে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইত না; অথবা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকাও চলিত না। অথবা মনে করুন, শত্রুসেনা গ্রাম বেড়িয়া বসিয়া আছে। বাহুবলে তাহাদিগকে প্রতিহত করা অসম্ভব। তাহারা গ্রামে অগ্নি সংযোগ করিবে,—গ্রামের প্রত্যেক গৃহ লুণ্ঠন করিয়া গ্রাম ভূমিসাৎ করিয়া চলিয়া যাইবে। গ্রামরক্ষার একমাত্র উপায়—তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে নিষ্ক্রয় প্রদান করা। এরূপ অবস্থায়ও পেশবা সরকার দেয় রাজস্ব কিছু কিছু রেহাই দিতেন। কিন্তু তাহাতে গ্রামবাসীদিগের সম্যক ক্ষতিপূরণ হইত না। এই সকল খরচের পরিমাণ অল্প হইলে, ট্যাক্স বসাইয়া টাকা তোলা হইত (এই ট্যাক্সের নাম সদর ওয়ারিদ পট্টী)। আর খরচের পরিমাণ অধিক হইলে, গ্রাম্যসমিতির কর্জ্জ করা ভিন্ন আর উপায় থাকিত না। এই গ্রাম্য-ঋণ পরিশোধের দ্বিবিধ উপায় ছিল। কখনও কখনও সদর ওয়ারিদ পট্টীর আয় হইতে প্রত্যেক বৎসর কিস্তি-বন্দীর হিসাবে ঋণ পরিশোধ করা হইত। আবার কখন-কখনও উত্তমর্ণকে দেয় ঋণের পরিবর্ত্তে নিষ্কর জমি দেওয়া হইত। জমির পরিমাণ অল্প হইলে করের কথা উঠিতই না। জমির পরিমাণ অধিক হইলে, তাহার কর সকল গ্রামবাসী মিলিয়া হারাহারি করিয়া দিতে হইত। এইরূপ নিষ্কর জমিকে মারাঠীতে 'গাঁও নিসবত ইনাম' বলে। সুতরাং আর্থিক ব্যাপারেও মহারাষ্ট্রের গ্রাম্য-

সমিতিগুলির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। খাজনা দেওয়া লইয়া তাহাদের পেশবা সরকারের সহিত সম্পর্ক। নিজেদের, দেব-মন্দিরের উৎসবাদির, ও অন্যান্য ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য গ্রাম্য-সমিতি ইচ্ছামত কর আদায় করিতেন, ঋণ করিতেন, ঋণ পরিশোধের জন্য ছোট বড় ইনাম জমি উত্তমর্ণকে দিতেন, ইহার জন্য পেশবা সরকারের অনুমতির অপেক্ষা রাখিতেন না; অথবা পেশবা সরকারও গ্রামের এই সকল আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এক কথায়, আজকালকার ভাষায় বলিতে গেলে, মারাঠা পল্লীগুলির সম্পূর্ণ Financial Autonomy ছিল। আবার পল্লী-সমাজের কর্ম্মচারিগণ গ্রাম-বাসিগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত না হইলেও পেশবা সরকারের বেতনভোগী ভৃত্যও ছিলেন না। তাঁহাদের যত কিছু পাওনা, তাঁহাদের গ্রাম হইতে। গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের আপনার লোক; সুতরাং গ্রাম্য সাধারণের মত উপেক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। পেশবার কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র। সুতরাং মারাঠা পল্লীগুলিকে মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি ছোট ছোট স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র বলা মোটেই অসঙ্গত নহে।

দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে

পাটীল ও কুলকর্ণী যেমন গ্রামের কর্ত্তা ছিলেন, সেইরূপ শিবাজীর পূর্ব্বে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে পরগণার কর্ত্তা ছিলেন।

পার্থক্য এই যে পাটীল ও কুলকর্ণী গ্রামবাসীদের উপরে বড় সহজে জুলুম করিতে পারিতেন না—আর পরগণার প্রত্যেক গ্রামের উপর জুলুম করাই ছিল দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য। অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য শিবাজী ইহাদের হাত হইতে রাজস্ব আদায়ের অধিকার কাড়িয়া লইলেন, কিন্তু ইহাদের পুরুষানুক্রমিক পাওনা হইতে ইহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন না। কারণ সহসা দরিদ্র অবস্থায় পড়িলে ইহারা দেশে নানা প্রকার অরাজকতার সৃষ্টি করিতে পারিত। পেশবাগণ শিবাজীর নীতির অনুসরণ করিয়া পরগণায় সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেরা পেশবাদিগের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেই আপনাদের প্রাচীন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অথচ ইংরেজ ঐতিহাসিক মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিনষ্টোন সে জন্য দায়ী করিয়াছেন ব্রাহ্মণ পেশবাদিগকে। তিনি এই পরিবর্ত্তনের মূলে—"the policy and avarice of the Brahmins"—ব্রাহ্মণদিগের কূটনীতি ও অর্থপিপাসা দেখিতে পাইয়াছেন। অবশ্য যে এলফিন্‌ষ্টোন পেশবাদিগের নিকট হইতে নববিজিত রাজ্য সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেতনভোগী ভৃত্য। সুতরাং অল্প দিন পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার খিড়কীর বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি তাঁহার একটু বিদ্বেষ থাকিবারই কথা। যদি ইতিহাস লিখিতে বসিতেন, তবে হয় ত পেশবাদিগের অযথা নিন্দা করিবার পূর্ব্বে একটু স্থিরভাবে বিচার করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিতেন।

রিপোর্ট ইতিহাস নহে, সরকারী দপ্তরের কাগজমাত্র। যাহা হউক, একটু পরেই তিনি বলিয়াছেন যে, এই পরিবর্ত্তনের ফল ভালই হইয়াছিল—"The change was attended with beneficial effects as delivering the people from the oppression and exaction of the Zemindars."

শিবাজীর সময়ে যে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেরা প্রজাপীড়ক ছিলেন, পেশবাযুগে তাঁহারাই হইয়াছিলেন প্রজার বন্ধু, কারণ, শিবাজীর নীতির ফলে প্রজার সহিত আর তাহাদের স্বার্থের বিরোধ ছিল না। তাই পেশবা-যুগে প্রজার দুঃখকষ্টের আবেদন লইয়া পাটীলের সহিত দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেও পুণা দরবারে উপস্থিত হইতেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের একখানি প্রাচীন দলিলে দেখিতে পাই যে, প্রান্তরাজপুরীর জমিদারেরা (দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণকেই মহারাষ্ট্রে জমিদার বলিত) খোত ও পাটীলগণের সঙ্গে সিদ্দির উপদ্রবে সর্ব্বস্বান্ত প্রজাগণের দুঃখকষ্টের কথা এবং অশান্তি ও অরাজকতার কালে পরিত্যক্ত জমির অবস্থা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পুণায় গিয়াছিলেন। (প্রান্ত রাজাপুরী যেথীল রায়ত শামলাচে দংগ্যা-মূলে তজাবজা জালী আহে। রয়তেচী কীর্দ হোউন পাবলী নাহী, নিত্য উঠোন দংগাচ আহে। যাস্তব স্বামীনী কৃপালু হোউন প্রান্ত মজকুরচী পহানী করুন পহানী প্রমাণে সাল মজকুরী বসুল ঘ্যাবা হ্মণোনি জমিদার ব খোত পাটীল য়ানী হুজুর পুণ্যাচে মুক্কামী য়েউন বিদিত কেলে।) ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জুন্নর প্রান্তের দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণ পেশবা

সরকারকে জানাইয়াছিলেন যে, মোগল আক্রমণে জুন্নর প্রান্তের গ্রামসমূহ দগ্ধ ও লুণ্ঠিত হইয়াছে; সুতরাং কৃষকগণকে রাজস্ব বিষয়ে অনুগ্রহ দেখান সরকারের কর্ত্তব্য। (ভিকাজী বিশ্বনাথ হবালদার তর্ফ খেত চাকণ দেশমুখ ব দেশপাণ্ডে সরকার জুন্নর য়ানী হুজুর য়েউন বিদিত কেলে (কী) প্রান্ত জুন্নরচে গাঁব মোগেলাঁচ্যা দংগ্যামূলেঁ জরালে ব লুটলে, পায়মল্লী খালী আলে। ত্যাঁস সুভা জাউন কৌল করার ঘেউন লাবনী করাবী।)

দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেরা রাজস্ব আদায়ের কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে পেশবা সরকারের কোন কাজেই আসিতেন না এমন নহে। সমস্ত বতনের স্বত্ব-বিষয়ক দলিলের নকল তাঁহাদের নিকটে থাকিত। প্রত্যেক নূতন দলিল দেশমুখের নিকটে রেজিষ্টারী করা হইত। আবার সরকারী রাজস্ব সরকারী কর্ম্মচারীর নিকটে দাখিল করিবার সময় পাটীল তাহার একপ্রস্থ হিসাব দেশমুখের নিকটে পাঠাইয়া দিতেন। পরগণার কর্ম্মচারী যখন পেশবা সরকারে হিসাব দাখিল করিতেন, তখন দেশমুখের হিসাবের সহিত তাহার হিসাব মিলাইয়া লওয়া হইত। ইহাতে মাম্‌লত্‌দার বা কামাবিস্‌দারের পক্ষে সরকারী টাকা আত্মসাৎ করা একটু কঠিন হইত। এল্‌ফিনষ্টোন্ লিখিয়াছেন যে,—"Long after the Zemindars ceased to be the principal agents, they were still made use of as a check on the Mamlatdar; and no account

was passed, unless corroborated by corresponding accounts from them." দলিল-দস্তাবেজ রেজিষ্টারী করিবার জন্য দেশমুখের নিকট শিক্কা মোহর থাকিত। দেশমুখী বতনের একাধিক মালিক থাকিলে, যাঁহার জ্যেষ্ঠাধিকার, শিক্কা মোহর তাঁহারই হেপাজতে থাকিত। বতনের সকল কার্য্য তিনিই করিতেন। অপর সকলে কেবল ইনাম জমি ও বতনের আয় ভোগ করিতেন।

পাটীলের ন্যায় দেশমুখের আয়ও নিতান্ত মন্দ ছিল না। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বলেন যে, দেশমুখ আদায়ী রাজস্বের শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন। তাঁহার ইনামের পরিমাণও নেহাৎ কম ছিল না; প্রত্যেক ১০০ বিঘার মধ্যে ৫ বিঘা তিনি ইনাম পাইতেন। এতদ্ব্যতীত পাটীলের মত তাঁহারও তৈলিকের নিকট হইতে তেল, চর্ম্মকারের নিকট হইতে জুতা, মুদীর নিকট হইতে সুপারী, বারুইয়ের দোকান হইতে পান প্রভৃতি পাওনা ছিল। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে ইনাম জমি বা পৈতৃক পদ অথবা তৎসংক্রান্ত বৃত্তি বিক্রয় বা দানের অথবা বন্ধক রাখিবার ক্ষমতা দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে-দিগের ছিল না। বিক্রয় বা বন্ধকের কথা বলিতে পারি না; —কিন্তু কখন কখনও দেশমুখ যে তাঁহার বৃত্তি অন্য প্রকারে হস্তান্তরিত করিতে পারিতেন, তাহার একটি প্রমাণ আছে। এই প্রমাণ একখানি 'বকশিসনামা'। এই প্রাচীন দলিলখানি শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ে তৎসম্পাদিত মারাঠা ইতিহাসের উপাদানের দশম খণ্ডে মুদ্রিত করিয়াছেন।

(রাজবাড়ে মরাঠাঞ্চা ইতিহাসাঞ্চি·সাধনে ১০ম খণ্ড ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই দলিলে দেখা যায় দেশমুখ গ্রাম-প্রতি ২৲ মাত্র পাইতেন। এই দলিলখানি হইতে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের মান পান ও হক্কের একটি সাধারণ তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। গ্রাম-প্রতি দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের পুরাতন পাওনা; তন্মধ্যে দেশমুখ ২৲ ও দেশপাণ্ডে ১৲ পাইবেন।

২। সরকারী শিরোপা প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে পাইবেন।

৩। 'বতন' সম্বন্ধীয় যাবতীয় দলিলপত্রে দেশমুখ নাম সহি করিবেন ও তাঁহার স্বাক্ষরের পার্শ্বে দেশপাণ্ডের সহি থাকিবে।

৪। সরকারী কর্ম্মচারীকে প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে ভেট দিবেন।

৫। সরকারের নিকট ও অন্যান্য লোকের নিকট হইতে পান প্রথমে দেশমুখ ও তৎপশ্চাতে দেশপাণ্ডে গ্রহণ করিবেন।

৬। দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে বতনের অন্যান্য যাবতীয় মান পান প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে পাইবেন।

৭। দেশমুখ বাসগ্রামে একখানি আবাস-বাটী নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড নিষ্কর জমি পাইবেন।

৮। আবাস-পল্লীর ও স্বীয় এলাকার সমস্ত গ্রাম্য-বাজার হইতে শাক-সব্জী পাইবেন।

৯। দেশমুখ 'জিরাইত' ও 'বাগাইত' উভয় শ্রেণীর ইনাম জমি ভোগ করিবেন। (যে সকল জমিতে কেবল শস্য উৎপন্ন

হইত তাহাকে 'জিরাইত' ও বাগান করিবার উপযোগী জমিকে 'বাগাইত' জমি বলে।)

১০। উৎসবের সময়ে প্রত্যেক গ্রামের মহারগণের নিকট হইতে জ্বালানি কাঠ দেশমুখের প্রাচীন পাওনা।

১১। সংক্রান্তির সময়ে তিল ও প্রত্যেক শ্রাদ্ধে ঘৃত দেশমুখ প্রত্যেক গ্রাম হইতে পাইবেন।

১২। পরগণার কার্য্যের জন্য দেশমুখ ও তাঁহার প্রতিনিধি দুইটি করিয়া ভেট পাঠাইবেন।

১৩। প্রত্যেক গ্রামের ধাঙ্গরগণের নিকট হইতে বার্ষিক একখানি কম্বল দেশমুখের পাওনা।

১৪। প্রত্যেক গ্রামের চর্ম্মকারগণের নিকট হইতে বার্ষিক একজোড়া জুতা দেশমুখের পাওনা।

১৫। 'সাবান' নামক ট্যাক্স প্রত্যেক গ্রাম হইতে দেশমুখ আদায় করিবেন।

১৬। শাহ দবসের মস্‌জিদের ভৃত্যগণ বার্ষিক ৩৲ হিসাবে 'তবরুকা' দিয়া থাকে। তন্মধ্যে ২৲ দেশমুখের ও ১৲ দেশপাণ্ডের প্রাপ্য।

১৭। প্রত্যেক গ্রামের দেয় খোরাকির ('ভাকরি বাবদ এবজ') টাকা দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইবেন।

১৮। কলাবন্ত, থের, গেরীপদিগকে (গীত বাদ্য করা ইহাদিগের কৌলিক বৃত্তি) প্রথমে দেশমুখ ও তৎপরে দেশপাণ্ডে পারিতোষিক দিবেন।

১৯। অন্যান্য নানাবিধ কার্য্যের নিমিত্ত প্রাপ্য নানাবিধ পারিশ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশ দেশপাণ্ডে ও দুই-তৃতীয়াংশ দেশমুখ পাইবেন।

২০। পরগণার কার্য্যসম্পর্কে সরকারে দেয় মধ্যে দেশমুখ দুই-তৃতীয়াংশ ও দেশপাণ্ডে এক-তৃতীয়াংশ বহন করিবেন।

এই তালিকায় দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের প্রধান প্রধান পাওনাগুলির উল্লেখ আছে, ছোট-ছোট পাওনাগুলি অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ করা হয় নাই; সুতরাং এই একখানি মাত্র দলিলের সাহায্যে সমস্ত পাওনার একখানি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিবার উপায় নাই। তবে মোটের উপর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের 'বতন বৃত্তি'ও পাটীল কুলকর্ণীর বতন বৃত্তির অনুরূপ। পাটীল ও কুলকর্ণী যেমন গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে পারিশ্রমিক পাইতেন সেইরূপ দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেগণের পারিশ্রমিক দিতেন তাঁহাদের নিজ-নিজ পরগণার অধিবাসিবর্গ; —পেশবা সরকার হইতে কোনও প্রকারের বেতন তাঁহারা পাইতেন না। সুতরাং পরগণার লোকের স্বার্থের সহিত তাঁহাদের স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

মহারাষ্ট্রে রমণীগণ প্রয়োজন হইলে কখন কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহাদের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। প্রথম রাজারামের বিধবা তারাবাই পেশবাদিগের ক্ষমতার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। উমাবাই দাভাড়ে ও অহল্যাবাই হোলকর এক-একটি রাজ্য-খণ্ডের

শাসন-কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা দাদার পত্নী আনন্দীবাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের জন্য ইতিহাসে চিরস্থায়ী অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেশপাণ্ডের কাজ স্ত্রীলোকদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া সেকালের মারাঠা পল্লীবৃদ্ধেরা সমীচীন মনে করিতেন না। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সরকার জুন্নরের একটি পঞ্চায়েতে স্থির হয় যে, "ভবিষ্যতে দেশপাণ্ডে বতন আর কখনও স্ত্রীলোকের নামে রাখা হইবে না"।*

* ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণাজী হরি দেশপাণ্ডের বিধবা গিরমাবাই অভিযোগ করেন যে, তাঁহাদের পরিবারে চারি-পাঁচ পুরুষ পর্য্যন্ত কাহারও ঔরস-পুত্র না থাকায়, বিধবারা দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার নামে বতনের কাজ চালাইয়া আসিতেছে; এই পারিবারিক প্রথা অনুসারে তিনিও দত্তক গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার পুত্র তাঁহাদের উভয়ের নামে কাজ চালাইতে অঙ্গীকার করে; কিন্তু কিছুকাল পরে বতনের কাগজ হইতে তাঁহার নাম তুলিয়া দেয়। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার দত্তক পুত্র ভগবন্ত রাও একটি ৫।৭ বৎসরের নাবালক পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন; ভগবন্ত রাওয়ের মৃত্যুর পরে বালকের কর্ম্মচারীরা গিরমাবাইর অধিকার অগ্রাহ্য করিতেছে, অতএব পারিবারিক বতনে তাঁহার ও নাবালকের উভয়ের সমান অধিকার সরকার হইতে বাহাল করা হউক। গিরমাবাইর আবেদন গৃহীত হইল, কিন্তু ইহাতে বতনের কাজে নানাপ্রকার গোলযোগ আরম্ভ হইল। সুতরাং নাবালক অমৃত রাও আবার পেশবা-সরকারের দ্বারস্থ হইলেন; তিনি আবেদন করিলেন যে, বতনের কাজের একটা পাকা বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। গিরমাবাইর দাবী গৃহীত হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার মৃত্যুর পরে অমৃত রাওয়ের বিমাতাও ঐরূপ দাবী করিতে পারেন;

পরগণা ও প্রদেশের কর্ম্মচারী

কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দার

নিজামশাহী ও আদিলশাহী সুলতানদিগের রাজত্বকালে শাসন-সৌকর্য্যার্থ সমগ্র মহারাষ্ট্র অন্যান্য মুসলমান-শাসিত প্রদেশের ন্যায় কতকগুলি পরগণা, সরকার ও সুভায় বিভক্ত হয়। শিবাজী এই বিভাগের একটু পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার সময়কার ক্ষুদ্রতম বিভাগ গ্রাম বা মৌজা; কয়েকটি মৌজার সমবায়ের নাম তরফ; এবং কয়েকটি তরফ লইয়া একটি সুভা গঠিত হইত। মৌজার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে হাবীলদার আর সুভার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সুভেদার বা মুখ্য দেশাধিকারী বলা হইত। পেশবা-যুগে পরগণা, তরফ, মৌজা, সুভা, সরকার প্রভৃতি সকল নামগুলিই প্রচলিত ছিল; এবং দলিল-পত্রে এই সকল শব্দই ব্যবহৃত হইত; কিন্তু তাহাদের অর্থগত প্রভেদ এই সময়ে একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। তবে সাধারণতঃ পেশবাদিগের কাগজপত্রে সুভার পরিবর্ত্তে 'প্রান্ত'

অতএব ঐ প্রশ্নেরও চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার একটি পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত হয়। পঞ্চায়েতের বিচারে স্থির হয় যে, বতন সম্পর্কীয় কাগজ-পত্রে গিরমাবাইর নাম থাকিবে, কিন্তু বতনের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে না। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্য কোন স্ত্রীলোক এই প্রকার অধিকারের দাবী করিতে পারিবেন না। "তিচে নঁাব তী জিবংত আহে তে পর্য্যন্ত দস্তকাঁত চলেবাসে। পুঢ়ে বায়কাঁচী নাবেঁ দস্তকাঁত চালবুঁ নয়ে।"

এবং তরফ ও পরগণার পরিবর্ত্তে 'মহাল' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট মহালের প্রধান কর্ম্মচারীর অভিধা ছিল কামাবিস্‌দার ও বড় বড় মহালের কর্ত্তা ছিলেন মাম্‌লত্‌দার। মাম্‌লত্‌দারেরা সাধারণতঃ পুণা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন, এবং হিসাব দাখিল করিতেন পুণা সরকারের নিকটে;—পেশবা সরকার ব্যতীত তাঁহাদের উপরে আর কোন উচ্চতর কর্ম্মচারী থাকিত না। কেবল খান্দেশ, গুজরাট ও কর্ণাটক* এই তিনটি প্রদেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত। এই প্রদেশ তিনটিতে মাম্‌লত্‌দারদিগের কার্য্যের পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত এক-একজন 'সরস্থুভেদার' থাকিতেন। তিনজন সরস্থুভেদারের ক্ষমতা ও বেতন কিন্তু সমান ছিল না। কর্ণাটকের সরস্থুভেদার আপনার অধীন মাম্‌লত্‌দারদিগকে বহাল ও বরখাস্ত করিতে পারিতেন, রাজস্ব আদায়-অনাদায়ের জন্য পেশবা সরকারের নিকটে তাঁহাকে দায়ী থাকিতে হইত। খান্দেশের সরস্থুভেদারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ইহা অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তিনি সেখানকার মাম্‌লত্‌দার ও কামাবিস্‌দারগণের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন মাত্র। তাঁহাদিগের নিয়োগ-বিয়োগেও তাঁহার কোনও হাত ছিল না, সুতরাং রাজস্ব আদায় বা অনাদায়ের দায়িত্বও তাঁহাকে বহন করিতে হইত না। সরস্থুভেদার কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দারদিগের ক্ষমতা, কর্ত্তব্য

* কর্ণাটক বলিতে প্রাচীন হিন্দুযুগের ন্যায় মারাঠাযুগেও মহীশূর প্রভৃতি সমস্ত দক্ষিণদেশীয় রাজ্য বুঝাইত। সুতরাং সেকালের কর্ণাটক আধুনিক ইংরাজী কর্ণাটক অপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত।

ও দায়িত্বের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইঁহাদের বেতনের কথা আলোচনা করা যাউক।

পেশবা-যুগের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, সকল কামাবিস্‌দার সমান বেতন পাইতেন না; অথবা এখনকার মত সেকালে এই সকল কর্ম্মচারীর কোন নির্দ্দিষ্ট 'গ্রেড' বা বেতনের হারও ছিল না। মহালের আয়তন ও আয়ের তারতম্য অনুসারে, কর্ম্মচারিগণেরও বেতনের তারতম্য হইত। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ত্রিম্বক হরি নামক এক ব্যক্তি বার্ষিক ১০০০৲ বেতনে সরকার হ্যাণ্ডের কামাবিস্‌দার নিযুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার তিন বৎসর পরে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ভূপাল পরগণার কামাবিস্‌দার রামচন্দ্র বল্লাল ৭০০০৲ বেতন পাইতেন। সাধারণতঃ এই সকল কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় যে-পরিমাণ রসদ বা আগাম টাকা দিতেন, তদনুপাতে তাঁহাদের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইত। ভূপাল পরগণার কামাবিস্‌দার পৌণে দুই লক্ষ টাকার রসদ দিয়াছিলেন; তিনি বেতন পাইতেন পৌণে দুই লক্ষের $\frac{1}{২৫}$ (শতকরা ৪৲) ৭০০০৲। (৭০০০৲ তুম্মাস বেতন রসদ পাবণে দোন লাখ রুপয়াস দরসদে ৪ রুপয়ে প্রমাণে)। ঠিক এই নিয়ম অনুসারেই এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডের মাম্‌লত্‌দারের বেতনের পরিমাণ তৎপ্রদত্ত রসদের শতকরা ৪৲ হিসাবে ১২৮০০৲ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। (তুম্মাস মুশাহিরা রসদেচা দরসতে রুপয়ে ৪ প্রমাণে ১২,৮০০ বারাহাজার অঠশে করার কেলে অসে)। রাও বাহাদুর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীসের মতে কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দার তাহাদিগের অধীন মহালের দেয়

বার্ষিক রাজস্বের শতকরা ৪৲ হিসাবে বেতন পাইতেন। Peshwas' Diaries, বালাজী বাজীরাও, প্রথম খণ্ডে ৪০৭ ও ৪০৯ সংখ্যক দলিলের পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"The remuneration of the Kamavisder of Bhupal was fixed at Rs 4 per cent of the revenue received." এবং "The Mamlot of Bundelkhand was entrusted to one person, and Rs. 320,000 were received from him in advance on account of land revenue. His remuneration was fixed at Rs. 12,800 at Rs. 4 per cent of the revenue."

রাও বাহাদুর পারসনীস বহুকাল মারাঠা ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের মত বিনা বিচারে উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু রাও বাহাদুর তৎসম্পাদিত বালাজী বাজীরাও প্রথম খণ্ডের আর কয়েকখানি দলিল ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার মত যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা উপরে যে দুইখানি দলিল হইতে দুইটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে যে, রসদের শতকরা ৪৲ হিসাবে বেতন নির্দ্ধারিত হইল। রসদ শব্দেব অর্থ রাজস্ব নহে। পেশবা সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না বলিয়া, তাঁহারা প্রত্যেক মহালের কর্ম্মচারীর নিকট হইতেই বৎসরান্তে বা নিয়োগের সময় কিছু অগ্রিম টাকা লইতেন। এই অগ্রিম দানের নাম রসদ। একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইবে যে, কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দারগণ ঠিক

নিজ নিজ রসদের শতকরা ৪৲ বেতন পাইতেন। ভূপালের কামাবিস্‌দার রামচন্দ্র বল্লাল ১,৭৫,০০০৲ রসদ দিয়াছিলেন; তিনি ৭০০০৲ বেতন পাইতেন। বুন্দেলখণ্ডের মাম্‌লত্‌দার লক্ষ্মণ শঙ্কর ৩,২০,০০০৲ রসদ দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বেতন হইয়াছিল, ১২,৮০০৲। আবার বালাজী বাজীরাওয়ের শাসনকালীন আর একখানি দলিলে দেখিতে পাই যে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ত্রিম্বক বাবুরাও নামক এক ব্যক্তি ৫ বৎসরের জন্য কসবা পুণতাম্বার কামাবিস্‌দার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুণতাম্বার রাজস্ব পাঁচবৎসরে ৪৫০০০৲ হইতে ৪৯০০০৲ পর্যন্ত 'ইস্তাবার' নিয়ম অনুসারে বাড়িবার কথা ছিল।

১৭৫৯—৬০—৪৫,০০০৲
১৭৬০—৬১—৪৬,০০০৲
১৭৬১—৬২—৪৭,০০০৲
১৭৬২—৬৩—৪৮,০০০৲
১৭৬৩—৬৪—৪৯,০০০৲

যদি রাও বাহাদুর পারসনীসের মত ঠিক হইত, তাহা হইলে পুণতাম্বার কামাবিস্‌দার রাজস্বের শতকরা ৪৲ হিসাবে অন্ততঃ ১৮০০৲ বেতন পাইতেন। কিন্তু পেশবা সরকার তাঁহাকে বার্ষিক ২০০৲ মাত্র বেতন দিতেন। (Peshwas' Diaries, Balaji Baji Rao, vol. I, p. 279 দেখুন।) মাম্‌লত্‌দার ও কামাবিস্‌দারগণ যে এক বৎসরের রাজস্বের সমান টাকা রসদ স্বরূপ দিতেন না, তাহার প্রমাণও রাও-বাহাদুর পারসনীস সম্পাদিত পেশবার ডায়েরীতে মুদ্রিত বহু দলিলে পাওয়া যায়। কসবা পুণতাম্বার কামাবিস্‌দার মাত্র

২০,০০০৲ টাকা রসদ দিয়াছিলেন, অথচ, তাঁহার মহালের বার্ষিক রাজস্ব ৪৫,০০০৲ টকার কম ছিল না।

সকল সময়েই যে কামাবিস্‌দারেরা রসদের ১/২৫ অংশ বেতন পাইতেন, এমন কথাও বলা যায় না। কসবা পুণতাম্বার কামাবিস্‌দারের কথাই ধরুন। তিনি বার্ষিক খাজনা আদায় করিতেন ৪৫ হইতে ৪৯ হাজার, বার্ষিক রসদ দিতেন ২০,০০০৲, রসদের অনুপাতে তাঁহার বেতন হওয়া উচিত ছিল ৮০০৲; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি বেতন পাইতেন ২০০৲। (মকতাপৈকী রসদ দরসালে রূপয়ে ২০,০০০ বীস হাজার প্রমাণে করাল কেলী অসে। দরসাল বীস হাজার রূপয়ে সরকারাঁত জমা করূন জাব ঘেত জানে। শিবন্দী ব মহাল মজকুরচী নেমনুক পেশজী প্রামাণে করার—২০০ কামাবিসদার)।

সাধারণতঃ কামাবিস্‌দারের আফিস-খরচ, পাল্কী-খরচ ও অন্যান্য খরচ চালাইবার জন্য পেশবা সরকার কিছু থোক টাকা মঞ্জুর করিয়া দিতেন। সরকার হ্যাণ্ডের কামাবিস্‌দার ত্রিম্বক হরির জন্য এই সম্পর্কে পেশবা সরকার যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা হইতে এই কথা বেশ ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। ত্রিম্বক হরির নিয়োগপত্র হইতে তাঁহার আফিস খরচ প্রভৃতির তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

কামাবিস্‌দার স্বয়ং	১০০০৲
মাসিক ৬০৲ হিসাবে ১১ মাসের বেতন দিয়া বারো মাস খাটাইয়া লইবার কড়ারে পাল্কী খরচ	৬৬০৲
৫০ জন সৈনিকের বাবদ	৭৫০০৲

মাসিক ২॥০, ২৸০ অথবা ৩৲ বেতনের ২০০ পেয়াদা রাখিতে হইবে। ইহাদিগকে বারো মাসেরই বেতন দিতে হইবে। চৌকীতে চৌকীতে প্রয়োজনমত মাসিক ৩॥০ বেতনের বারো জন কারকুন বা মুহুরী রাখিতে হইবে।

নিম্নলিখিত কারকুনেরা ১০ মাসে নিম্নলিখিত হারে বেতন লইয়া বারোমাস চাকরী করিবে ঃ—

মজুমদার	২৫৲
নারোরাম ফড়নিস্	২৫৲
শিবাজী দাদাজী চিটনীস	২৫৲
শিরমাজী আবজী, কারকুন	২৫৲
জনার্দ্দন ভাস্কর, কারকুন	২৫৲
বিসাজী যাদব, ভিকাজী তানদেব, মোরো শামরাজ এবং গিরমাজী নামক চারিজন কারকুন জনপ্রতি ১৫৲ হিসাবে	৬০৲
বাবুজী ত্রিমল, গোবিন্দশিবদেব, শিবাজীরাম ও বেঙ্কাজী অনন্ত নামক চারিজন কারকুন, জনপ্রতি ১২৲ টাকা হিসাবে	৪৮৲

এই তালিকা হইতেই বেশ বুঝা যায়, পেশবা-সরকার প্রত্যেক মহালের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখিতেন। এই তালিকায় দুইটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। (১) বারোমাস চাকরী করিয়া দশমাস বেতন পাইবার নিয়ম ও (২) পাল্কী-খরচ। এই দশমাসী বেতন ও বারোমাসী চাকরীর নিয়ম কেবল শাসন-

বিভাগে নয়, সেনা-বিভাগেও প্রচলিত ছিল। বোধহয়, এই নিয়ম প্রথমে মোগল-সেনা-বিভাগের অনুকরণে মারাঠা-সেনাদলে প্রবর্ত্তিত হয় ও ক্রমে-ক্রমে তথা হইতে মারাঠা শাসন-বিভাগেও বিস্তার লাভ করে। পেশবা-যুগের পাল্কী-খরচের সহিত এখনকার রাহা-খরচ বা travelling allowance-এর তুলনা করা সঙ্গত হইবে না। ইংরাজ আমলে যেরূপ সরকারী কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ বিভাগে কার্য্যের উৎকর্ষের জন্য 'রায় বাহাদুর', 'খাঁ বাহাদুর', 'দেওয়ান বাহাদুর', 'রায় সাহেব', 'খাঁ সাহেব' প্রভৃতি উপাধি পাইতেন, সেইরূপ পেশবা-যুগের কর্ম্মচারিগণ পাল্কী ও 'আপ্তাগিরি' প্রভৃতি ব্যবহার করিবার সম্মান লাভ করিতেন। কিন্তু খালি পাল্কী চড়িবার অধিকার পাইলেই ত হয় না; পাল্কী কেনা চাই, পাল্কী বহিবার জন্য বেহারা চাই ও এই সকল ব্যয়ের জন্য টাকা চাই। পাছে রাজদত্ত সম্মান দরিদ্র কর্ম্মচারীর পক্ষে পুরস্কার না হইয়া বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়ায়, এই ভয়ে পেশবা-সরকার কোন কর্ম্মচারীকে পাল্কী বা আপ্তাগিরি ব্যবহারের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে এই অধিকার সম্ভোগের জন্য কিছু টাকাও 'পাল্কী-খরচ' বা 'আপ্তাগিরি খরচ' বাবদ মঞ্জুর করিতেন। অনেক 'রায়বাহাদুর' ও 'খাঁ বাহাদুর' যে রাজসরকার হইতে পদমর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিবার খরচ পাইলে বাঁচিয়া যাইতেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দার পেশবার প্রতিনিধি;—সুতরাং পেশবা সরকারের তাবৎ রাজক্ষমতাই ইহারা পরিচালন করিতেন। সুতরাং ইহাদের কর্ত্তব্যের সংখ্যা ও দায়িত্বের পরিমাণ

খুব বেশী ছিল। একদিকে যেমন রাজস্ব আদায়ের সহিত, কামাবিস্‌দারকে কৃষকের হিত-সাধন, কৃষির বিস্তার ও উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত, অপর দিকে আবার তাঁহাকে মহালের মধ্যে নব-নব শিল্পকলার প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল প্রকারের মামলার তদন্ত করিয়া বিচারের জন্য পঞ্চায়েত নিয়োগ করিতেন কামাবিস্‌দার; ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও সামাজিক সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন তিনি; মহালের 'শিবন্দী সেনা' ও পুলিশের কর্ত্তাও ছিলেন তিনি; সুতরাং পরোক্ষভাবে শান্তিরক্ষার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু এইখানেই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। পেশবা-যুগের মারাঠাগণ আবার মধ্যযুগের য়ুরোপীয়দিগের মত ভূতপ্রেত ও ডাইনীদিগের কুহক-শক্তিতে আস্থাবান ছিল। কাজেই মহালে ভূতের উৎপাত হইলে, কোন ডাইনীর কুহকে কোন প্রজার ধনসম্পত্তি বা জীবনের অনিষ্ট হইলেও, তাহার প্রতিকারের জন্য আতঙ্কিত জনসাধারণ কামাবিস্‌দারের দ্বারস্থ হইত। এত ক্ষমতা যাহার, ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ বা সুবিধা যে তাহার একেবারেই ঘটিত না, তাহা নহে, সুতরাং মারাঠা-কর্ম্মচারিগণের উৎকোচ-প্রিয়তার বহু বিবরণ বিদেশী লেখকগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়। শিবাজীর সমকালীন ইংরেজ পর্য্যটক ডাক্তার ফ্রায়ার (Fryer) ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সৈনিক মেজর ব্রুটন্ (Broughton) উভয়েই মারাঠা-কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। ফ্রায়ার বলেন যে, একজন মারাঠা কর্ম্মচারী শিবাজীর দরবারে

আগত ইংরেজদূত অস্কিন্‌ডেনকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তাড়াতাড়ি কাজ করিয়া লইতে হইলে উপহারের তালিকাটি আরও কিছু বাড়ানো দরকার। আর ব্রুটন্‌ বলেন যে, দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাঁহার এক মৃত ভাগিনেয়ের জন্যও খেলাত চাহিয়াছিলেন ; নতুবা অপর সকলকে খেলাত পাইতে দেখিলে তাঁহার ভগিনীর লুপ্তপ্রায় পুত্রশোক আবার প্রবল হইবার সম্ভাবনা। এই উপহার-প্রিয়তার বা অভদ্র ভাষায় উৎকোচের লোভ যে মারাঠাদিগেরই একচেটিয়া ছিল, এমন নহে। সেকালের ইংরেজ বা মুসলমান কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে মারাঠা কর্ম্মচারিগণের অপেক্ষা যে নৈতিক হিসাবে খুব উন্নত ছিলেন, এমন বোধ হয় না। হকিন্স এবং রো-র (Hawkins এবং Rowe) ভারত-প্রবাস-কাহিনীতে মোগল কর্ম্মচারিগণের যে অর্থ লোলুপতার বিবরণ আছে, তাহা সে কালের নবাব, আমীর ও ওমরাহদিগের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নহে। ইহারা নাকি পাশ্চাত্য বণিকের বাক্স-পেঁটরার ভিতরের সন্ধান পাইবার জন্য অসঙ্গত কৌতূহল প্রকাশ করিতেন। আবার বিলাতী জজের যে চিত্র সেক্‌স-পীয়রের অমর তুলিকায় অঙ্কিত হইয়াছে—"the justice in fair round belly with good capon lined"—তাহাতে এলিজাবেথের যুগে স্থূলোদর বিলাতী-ধর্ম্মাবতারের আনুকূল্যও যে উৎকোচ দ্বারা ক্রয় করা যাইতে পারিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহার ঐতিহাসিক উদাহরণ স্বনামখ্যাত লর্ড বেকন্‌। ভাগ্যদোষে তিনি ধরা পড়িয়া কলঙ্কের ভাগী হইয়াছেন। কিন্তু

যাঁহারা ধরা পড়েন নাই, তাঁহাদের সংখ্যাও বোধ হয় কম নহে। যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী, কোম্পানী বাহাদুরের চাকরী করিতে এ দেশে আসিতেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে 'কালা-আদমীর' চেয়ে বড় বেশী উন্নত ছিলেন না। ক্লাইব ও তাঁহার সহযোগীরা অল্পকাল ভারত প্রবাসের পরই স্বদেশে ফিরিয়া সকল জিনিসের বাজার-দর যেরূপ চড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহাতেই ইহা বেশ বুঝা যায়। আবার, ওয়েলিংটনের ডেস্‌প্যাচে পড়িয়াছি যে, তাঁহার অধীন একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। একজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট চোরাই মাল খরিদ করিয়াছিলেন এবং অপর দুইজন লেফ্‌টেন্যাণ্ট বাজারে যাইয়া উপদ্রব করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি-ভোগ করিয়াছিলেন। সে-কালের লোকের চক্ষে উৎকোচ-গ্রহণ খুব গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। উৎকোচ বা উপহার প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীর ন্যায্য পাওনা বলিয়াই পরিগণিত হইত। সুতরাং ভারতে এবং বিলাতে উভয় দেশেই এক সময়ে উৎকোচ দান ও গ্রহণ পূরামাত্রায় প্রচলিত ছিল। পেশবা-রাজত্বের শেষভাগে মারাঠা কর্ম্মচারীরা প্রকাশ্যেই 'অন্তস্থ' বা 'দরবারখরচ' দাবী করিতেন; বিলাতে এ রকম খোলাখুলি ছিল না, এই যা প্রভেদ।

অত্যাচার ও অনাচার সকল দেশে, সকল যুগে, সকল গবর্ণমেণ্টের অধীনেই অল্পাধিক পরিমাণে থাকে, পেশবা যুগেও ছিল। কিন্তু কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দার যাহাতে তাঁহাদের বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারেন, সে দিকে

পেশবা-সরকারের সতর্কতার অভাব ছিল না। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর কর্ম্মচারীর সাহায্যে পেশবা-সরকার কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দারের ক্ষমতার অপব্যবহার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদিগের সহিত আমাদের ইতঃপূর্ব্বেই সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইঁহাদের নিকটে গ্রাম্য-রাজস্বের এক-এক প্রস্থ হিসাব থাকিত। মাম্‌লত্‌দার ও কামাবিস্‌দারের সহিত এই হিসাব মিলাইয়া লওয়া হইত; সুতরাং হিসাব জাল করা অথবা মিথ্যা হিসাব দেওয়া পরগণার কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারী-দিগের সাধারণ নাম 'দরখদার'। পাটীল, কুলকর্ণী, দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের মত ইঁহারা নিজ-নিজ পৈতৃক পদ উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষানুক্রমে পাইতেন। ইঁহাদিগকে বহাল বা বরখাস্ত করিবার ক্ষমতাও কামাবিস্‌দারের বা মাম্‌লত্‌দারের ছিল না; অথবা ইঁহারা নিজ নিজ পৈতৃক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পারিলে, ইঁহাদিগের দ্বারা অন্য কাজ করাইয়া লইতেও কামাবিস্‌দার ও মামলতদার পারিতেন না। যদি তাঁহারা ঐরূপ অসঙ্গত চেষ্টা করিতেন, তবে দরখদারেরা পেশবা-সরকারের নিকট আবেদন করিয়া তাহার প্রতিকার করিয়া লইতে পারিতেন।

দরখদার

প্রত্যেক কামাবিস্‌দারের ও মাম্‌লত্‌দারের আফিসে বার জন কারকুন ব্যতীত ৮ জন 'দরখদার' থাকিতেন। মহাল সম্পর্কীয় প্রধান প্রধান কাজ ইঁহাদের সম্মতি বা সহযোগিতা

ভিন্ন সম্পন্ন হইবার উপায় ছিল না। নিম্নে ৮ জন দরখদারের তালিকা দেওয়া গেল ঃ—

১। দেওয়ান।

২। মজুমদার।

৩। ফড্‌নবিস্।

৪। দপ্তরদার।

৫। পোতনীস্।

৬। পোতদার।

৭। সভাসদ্।

৮। চিটনীস্।

এই সকল 'দরখদার' মামলতদারের নিকট হইতে বেতন পাইতেন না; সুতরাং ইঁহারা প্রয়োজন বোধ করিলে মামলতদারের কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে পেশবা-সরকারের নিকটে সকল সংবাদ পাঠাইতে ভীত হইবেন না, এই ভরসায়ই বোধহয় প্রত্যেক বিভাগেই কতকগুলি দরখদার রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইঁহাদের কর্ত্তব্যগুলি আবার এমন দক্ষতার সহিত বিভাগ করা হইয়াছিল যে, আট জন দরখদারের মধ্যে কাহারও অজ্ঞাতে শাসন বা রাজস্ব-সম্পর্কীয় কোন কাজ হইবার উপায় ছিল না। দেওয়ান সকল হুকুমনামা ও চিঠি-পত্র সহি করিতেন। মজুমদার প্রত্যেক দলিল ও হিসাব সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করিয়া ফড্‌নবিসের নিকটে পাঠাইতেন। ফড্‌নবিস প্রত্যেক দলিল ও হুকুমনামায় তারিখ লিখিয়া দিতেন এবং দৈনিক কাজের ও হিসাবের খসড়া লিখিতেন। টাকার থলিয়ায় তিনিই হিসাবের

চিঠি বাঁধিয়া দিতেন। প্রত্যেক গ্রামের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার কাগজে তারিখ লিখিয়া দিতেন; এবং পরিশেষে সকল খাতাপত্র তিনিই সদরে লইয়া আসিতেন। দপ্তরদার ফড্‌নবিসের দৈনিক খস্‌ড়া হইতে খতিয়ান-বহি তৈয়ার করিতেন এবং মাসান্তে আয়-ব্যয়ের মোটামুটি একটা হিসাব সরকারে পাঠাইতেন। পোতনীস আদায়ী রাজস্বের ও নগদ টাকার হিসাব রাখিতেন এবং দৈনিক হিসাবের খস্‌ড়া ও খতিয়ান লিখিতে সাহায্য করিতেন। প্রত্যেক আফিসে দুই জন করিয়া পোতদার থাকিত,—মুদ্রার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করাই ছিল ইঁহাদের কাজ। সভাসদ্ ছোট-ছোট মামলা-মোকর্দ্দমার রেজিষ্ট্রি রাখিতেন ও মাম্‌লত্‌দারের নিকট তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিতেন। চিটনীস সকল প্রকার চিঠিপত্র লিখিতেন ও চিঠিপত্রের জবাব দিতেন (Bombay Gazetteer, Poona volumes দেখুন)। এতদ্ব্যতীত প্রথম মাধব রাওয়ের সময়ের একখানি প্রাচীন দলিলে 'জমেনীস' নামক আর একজন কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দলিলখানিতে জমেনীসের কর্ত্তব্য নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে—

১। সরকারী কর্ম্মচারীরা জিরাইত ও বাগাইত জমি পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদের মন্তব্য ও রিপোর্ট জমেনীসের নিকটে দাখিল করিবেন। জমেনীস প্রয়োজনমত তদন্ত করিয়া তৎসাহায্যে খাজনার হার নির্দ্ধারণ করিয়া কারভারীকে জানাইবেন।

২। রাজস্ব-সম্পর্কীয় যাবতীয় হিসাব জমেনীসের নিকট দিতে হইবে। আদায়-বাকী নির্ভুলভাবে লেখা হইল কি না, তাহার প্রতি জমেনীস নজর রাখিবেন।

৩। গ্রাম্য-রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা জমেনীসের থাকিবে। আবার আবশ্যক বিবেচনা করিলে কয়েক বৎসরের জন্য তিনি রাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মাপ করিতে পারিবেন।

৪। বাকী আদায়ের হুকুম জমেনীস দিবেন।

৫। রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিবার 'কৌল' জমেনীসের নামে বাহির হইবে।

৬। ফড্‌নবিসের দৈনিক খসড়া হইতে গ্রাম্য-রাজস্বের আদায়বাকীর খতিয়ান জমেনীস প্রস্তুত করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আটজন দরখদারের মধ্যে কেহই অপর কাহারও অজ্ঞাতে রাজস্ব বা শাসন-সম্পর্কীয় কোন কিছু করিতে পারিতেন না। ইঁহারা কিরূপে পরস্পরের কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাহা ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ধারবারের মাম্‌লত্‌দার ব্যঙ্কট নারায়ণের লিখিত দুইখানি পত্র হইতেই বেশ বুঝা যাইবে। এই চিঠি দুইখানিতে মজুমদার ও দপ্তরদারের কার্য্যতালিকা দেওয়া হইয়াছে। মজুমদার জমেনীস, ফড়্‌নবিস ও চিটনীসের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার, দপ্তর-দারকে কামাবিস্‌দারের নিকট হিসাব দাখিল করিবার আগে ফড্‌নবিসকে হিসাব সম্পর্কীয় সকল কথা বুঝাইয়া দিতে হইত।

মজুমদারের কার্য্যতালিকা

১। তিনি প্রতিদিন দৈনিক হিসাব মিলাইয়া লইবেন।

২। ফড্‌নবিস ও চিটনীস লিখিত প্রত্যেক হিসাব ও চিঠি তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

৩। নব-নিযুক্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের বেতনের অঙ্ক ঠিক করিয়া যোগ দেওয়া হইল কিনা তিনি দেখিবেন, এবং প্রত্যেক মাসে অশ্বারোহী ও পদাতিকদিগের হাজিরা লইবেন।

৪। মহালের যে অংশের নিমিত্ত সহকারী মাম্‌লত্‌দার নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহার আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব মজুমদার প্রস্তুত করিবেন এবং মাম্‌লত্‌দারের সদরে দেয় হিসাবও মজুমদারের মারফতে দিতে হইবে।

৫। মজুমদারের অজ্ঞাতে মাম্‌লত্‌দার পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

দপ্তরদারের কার্য্যতালিকা

১। ফড্‌নবিস দৈনিক খসড়া লিখিবেন ও তাহা হইতে দপ্তরদার খতিয়ান তৈয়ারী করিবেন।

২। বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব দপ্তরদার প্রস্তুত করিবেন। বর্ষান্তে কামাবিস্‌দারের হিসাব তিনি কাগজ-পত্রের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিবেন।

৩। প্রজাদিগকে প্রদত্ত ঋণ ও তাহা পুনরাদায় সম্বন্ধীয় তদন্ত দপ্তরদার করিবেন।

৪। মহালের সোয়ার বা অশ্বারোহী-সেনা-সম্পর্কীয় হিসাব দপ্তরদার পরীক্ষা করিবেন।

৫। দপ্তরদার সমস্ত হিসাব ফড্‌নবিসকে বুঝাইয়া দিবেন ও তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া মাম্‌লত্‌দারের নিকট হিসাব দাখিল করিবেন।

৬। ফড্‌নবিস নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে যে সকল হুকুম দিবেন, তাহা দপ্তরদারের মারফতে দিতে হইবে।

৭। ফড্‌নবিসের অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্য দপ্তরদার করিবেন।

মাম্‌লত্‌দারেরা যাহাতে রাজস্ব আত্মসাৎ করিতে বা প্রজাদিগের উপর অন্যায় উৎপীড়ন করিতে না পারেন, তাহার জন্য পেশবা-সরকার আরও দুইটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। মাম্‌লত্‌দার ও কামাবিস্‌দারের বেতনের হার আলোচনা করিবার সময়ই আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক মাম্‌লত্‌দার ও কামাবিস্‌দার তাঁহাদের নিয়োগের সময় পেশবা-সরকারকে কিছু 'রসদ' বা অগ্রিম টাকা দিতেন। এই টাকার জন্য তাঁহারা পেশবা-সরকার হইতে মাসিক শতকরা ১৲ টাকা হইতে ১॥০ টাকা হিসাবে সুদ পাইতেন। পেশবাগণের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, সুতরাং রাজস্বের কিয়দংশ অগ্রিম পাওয়াতে যেমন একদিকে অর্থাভাবের অসুবিধা কিয়ৎ-পরিমাণে দূর হইত, সেইরূপ মাম্‌লত্‌দার ও কামাবিস্‌দারদিগের কতকটা ভয়

থাকিত যে, মহালের প্রজাসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিলে অথবা রাজস্ব-আদায়-সম্পর্কে কোন প্রকারের অপরাধ ধরা পড়িলে 'রসদে'র টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। মাম্‌লত্‌দারের অসাধুতা নিবারণের দ্বিতীয় উপায় 'বেহেডা' বা বার্ষিক আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব। পুণা-দপ্তরের কাগজ-পত্র হইতে বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত এই 'বেহেডা' প্রস্তুত করা হইত, এবং সাধারণতঃ 'বেহেডা'র অতিরিক্ত কোন খরচ লিখিতে মাম্‌লত্‌দারেরা সাহসী হইতেন না। এত সতর্কতা সত্ত্বেও কিন্তু মাম্‌লত্‌দার ও কামাবিস্‌দারের 'উপরি-রোজগার' বন্ধ হয় নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলেন ঃ—

The sources of their profit was concealment of receipt (especially fees, fines and other undefined collections), false charges for remission, false musters, non-payment of pensions and other frauds in expenditure. This grand source of their profit was an extra assessment above the revenue which was called Saudar Warrid Puttee. ... ... One of the chief of these expenses was called Durbar khurch or Antast. This was originally applied secretly to bribe Ministers and Auditors. By degrees, their bribes became established fees, and the account was audited like the rest, but as bribes were still

required, another collection took place for this purpose, and as auditors or accountants did not search minutely into these delicate transactions the Mamlatdar generally collected much more for himself than for his patron." অর্থাৎ জরিমানা, নজর প্রভৃতি আদায়ের অনুল্লেখ, মিথ্যা রেহাইর ও মিথ্যা হাজিরার, মিথ্যা খরচের ও পেন্সনের হিসাবই মাম্‌লত্‌দারদিগের উপরি-রোজগারের প্রধান উপায়। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান লাভ হইত, 'সদর ওয়ারিদ পট্টী' হইতে। এতদ্ব্যতীত 'দরবার খরচ' বা 'অন্তস্থ' অথবা সরলভাষায় হিসাব-পরীক্ষককে দিবার জন্য উৎকোচ হইতেও তাঁহাদের বেশ আয় হইত। উৎকোচের জন্য যে পরিমাণ টাকা আদায় হইত, তাহার সমস্ত অথবা অধিকাংশও হিসাব-পরীক্ষকের বাক্‌সে উঠিত না ; সুতরাং তাহা হইতেও মাম্‌লত্‌দারের বেশ মোটা রকম লাভ হইত।

মাম্‌লত্‌দার এইরূপ বিবিধ উপায়ে নিজের আয়-বৃদ্ধি করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাদের বড় বেশী লোকসান হইত না, লোকসান হইত সরকারের। মাম্‌লত্‌দার জানিতেন যে, প্রজারা নিঃস্ব হইয়া পড়িলে তাঁহার আয়ের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে সুতরাং সুবর্ণ-অণ্ড সংগ্রহের সময় সুবর্ণপ্রসূ হংসীর প্রাণরক্ষার জন্য সাধ্যমত যত্নবান্ হইতেন। প্রজাদিগের উপর নূতন নূতন ভার চাপান হইত না সত্য, কিন্তু পেশবার রাজকোষে যত অর্থ সংগৃহীত হওয়া উচিত ছিল, এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে, তত অর্থ পুণার দরজা কখনও পার হইত না।

সাধারণতঃ মাম্‌লত্‌দার ও কামাবিস্‌দারেরা অল্প কয়েক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন। শিবাজীর আমলে ইঁহাদিগকে এক মহাল হইতে অন্য মহালে, এখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেদের ন্যায় বদ্‌লী করা হইত। পেশবাযুগে মাম্‌লত্‌-দারেরা বিশেষ গুরুতর কোন অপরাধ না করিলে একই মহালে ৩০।৪০ বৎসরকাল নিরুপদ্রবে কাটাইয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাদের পুত্রগণ পেশবার অনুগ্রহে সেই কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতেন। সুতরাং প্রত্যেক মহালের সহিত তথাকার মাম্‌লত্‌দারের একটা স্থায়ী সম্পর্ক জন্মিত এবং দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে তথাকার অধিবাসীদিগের জন্য তাঁহাদের একটু আন্তরিক মমতাও হইত। কোন অর্থলোভী মাম্‌লত্‌দার প্রজার উপর অযথা অত্যাচার করিলে, পেশবা-সরকার তাঁহাকে বরখাস্ত করিতে একটুও ইতস্ততঃ বা বিলম্ব করিতেন না। এই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়াছে কেবল পেশবা-কুল-কলঙ্ক দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের সময়। তিনি অর্থলোভে কতকগুলি ধর্ম্মজ্ঞানহীন লোকের নিকট মহাল ইজারা দিয়াছিলেন। এই ইজারা-নীতির ফল পেশবা ও তাঁহার প্রজাবর্গ উভয় পক্ষের কাছেই বিষময় হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাম্‌লত্‌দার বা কামাবিস্‌দারগণ হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই সকল রাজকর্ম্মচারী ছিলেন গ্রাম্যসঙ্ঘ ও হুজুর দপ্তরের মধ্যে সংযোগসেতুস্বরূপ। পল্লীসঙ্ঘ ও মহালের কর্ম্মচারীদিগের কথা বলা হইয়াছে। এইবারে হুজুর-দপ্তরের আকৃতি-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

হুজুর-দপ্তর

পুণার হুজুর-দপ্তর মারাঠা-সাম্রাজ্যের "ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েট"। এইখানে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় দুইশত কারকুন কাজ করিত। মারাঠা-সাম্রাজ্যের শাসন সম্পর্কীয় যে কোন তথ্য এই দপ্তর হইতে পাওয়া যাইত। পরগণার দেশমুখ ও দেশপাণ্ডেদিগের প্রদত্ত রাজস্বের হিসাব, মহালের কামাবিস্‌দার ও মামলত্‌দারদিগের প্রদত্ত হিসাব, পাটীল ও কুলকর্ণী প্রদত্ত গ্রাম্য-রাজস্বের হিসাব, বনবিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব, শুল্ক-বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সরঞ্জাম ও ইনাম-জমির হিসাব, সৈনিক-বিভাগের হাজিরা প্রভৃতি যাবতীয় সরকারী কাগজ এই হুজুর-দপ্তরে রক্ষিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ নানা ফড্‌নবিস হুজুর-দপ্তরের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইংরেজ অধিকারের পর পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত ৮৮ বৎসরের সমস্ত কাগজ এই দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে সুশৃঙ্খলভাবে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা সে-কালের মারাঠা-কারকুনগণের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

হুজুর-দপ্তরের কর্ত্তা ছিলেন, হুজুর ফড্‌নবিস। মহালের আফিসেও এক-একজন ফড্‌নবিস থাকিত, এইজন্য পুণার ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটের বড় কর্ত্তাকে হুজুর ফড্‌নবিস বলা হইত। এই বিরাট আফিস পরিচালনার জন্য যে বহু অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হইত, তাহা বলাই বাহুল্য।

সুবিধার জন্য হুজুর-দপ্তর বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার মধ্যে চালতে (চলন্ত) দপ্তর ও একবেরীজ দপ্তরই প্রধান। একবেরীজ দপ্তরে সকল প্রকার হিসাব-নিকাশের কাজ হইত বলিয়া এই আফিসটি সর্ব্বদাই পুণায় থাকিত। আর চালতে দপ্তরের কাজ ফড্‌নবিসের নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইত।

চালতে-দপ্তরে আবার ফড্, বেহেডা, সরঞ্জাম প্রভৃতি কতকগুলি বিভাগ ছিল। ফড্, ফড্‌নবিসের নিজস্ব বিভাগ। সমস্ত হুকুম, সনন্দ প্রভৃতি এই বিভাগ হইতে দেওয়া হইত। এই বিভাগে অন্যান্য বিভাগ হইতে সকল তথ্য সংগৃহীত হইত এবং ফড্‌নবিস স্বয়ং সকল হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। বেহেডা বিভাগে বেহেডা বা বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত হইত। পুরাতন আয়-ব্যয়ের হিসাব, গ্রাম্য রাজস্ব ও মহালের রাজস্বের স্বতন্ত্র হিসাবের সাহায্যে বেহেডা প্রস্তুত করা হইত। বেহেডা তৈয়ারী করিতে মারাঠা-কারকুনেরা এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন যে, কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দার প্রায়ই রাজস্ব-আদায়-কালে এই বেহেডার অন্যথা করিতে পারিতেন না। সরঞ্জাম-বিভাগে সকল সরঞ্জাম ও ত্বমাল্লা জমির হিসাব রাখা হইত।

একবেরীজ দপ্তরে সমস্ত বিভাগের সকল হিসাব একত্র করিয়া, আদ্যক্ষর-অনুসারে সাজাইয়া রাখা হইত। সুতরাং প্রত্যেক বৎসরের আয়-ব্যয় ও উদ্‌বৃত্ত টাকার পরিমাণ অল্প সময়ের মধ্যে বাহির করিয়া লইতে মোটেই কষ্ট হইত না।

একবেরীজ-দপ্তরের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে হুজুর-দপ্তরের কর্ম্মচারীরা গ্রামের ও মহালের হিসাবের ভুল-প্রতারণা যে সহজে ধরিয়া ফেলিতেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

মিঃ ম্যাক্‌লিয়ড (Macleod) দপ্তরের কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসযোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ; সুতরাং এই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মারাঠা-সাম্রাজ্যের পতনের পরেও, বতনের স্বত্ব লইয়া কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলেই বতনদারগণ তাঁহাদের মালিকী-স্বত্বের দলিলের খোঁজ হুজুর-দপ্তরে করিতেন। ইনাম-কমিশনের তদন্তকালে বহু সম্ভ্রান্ত জায়গীরদার মূল দলিল কমিশনের নিকট উপস্থিত করিতে অপারগ হইয়া পুণার হুজুর দপ্তরে অনুসন্ধান করিতে কমিশনের কর্ম্মচারিগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। পারসনীস পরিবারের তদানীন্তন কর্ত্তা, মিঃ হেন্‌রী ব্রাউন্‌কে লিখিয়াছিলেন,—"ইহার (অর্থাৎ তাঁহাদের মালিক-স্বত্বের) নিদর্শন পেশবা-সরকারে মারাঠা দপ্তরে আছে।" (ত্যাচে দাখলে পেশবে সরকার চে মারাঠা দপ্তরীঁ আহেত।—পারসনীস ও মাবজী সম্পাদিত কৈফিয়ৎ য়াদী দেখুন।) বিসাজী কৃষ্ণ বিনীওয়ালার বংশধরও উপরিউক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট লিখিয়াছিলেন—"পুরাতন কাগজের নকল আমাদের কাছে আছে, তাহাই আপনাকে দেখিবার জন্য পাঠাইলাম, মূল কাগজ দপ্তরে আছে।" (জুনে কাগদাবরীল নকল আম্মা পাশীঁ আহে। তী পাহন্যা করিতা পাঠবিলী আহে অসসল দপ্তরীঁ আহে।—পারসনীস ও মাবজী-

সম্পাদিত কৈফিয়তাদি দেখুন)। হুজুর-দপ্তরের কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও সততায় বিশ্বাস না থাকিলে সে-কালের জায়গীরদার ও বতনদারগণ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দপ্তরে পাওয়া যাইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন কি?

পেশবা সরকারের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় হুজুর-দপ্তরেও দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের রাজত্বকালে তত্ত্বাবধানের অভাবে নানারূপ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। এই দুর্ব্বুদ্ধি পেশবার সময়েই মারাঠা সাম্রাজ্যের সহিত পুণার হুজুর-দপ্তরেরও বিলোপ হয়। ম্যাকলিয়ড লিখিয়াছেন—

"The Dafter was not only much neglected but its establishment was almost done away with, and people were even permitted to carry away the records or do with them what they pleased." হুজুর-দপ্তরে যে সকল পুরাতন দলিল পাওয়া গিয়াছিল, তাহার কতক বিলাতে চলিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট বোম্বাই সরকারের তত্ত্বাবধানে পুণা নগরীতেই রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু দপ্তর-গৃহের চিহ্নমাত্রও এখন সেখানে নাই।

রাজস্ববিভাগ

পেশবাদিগের বরাবরই টাকার টানাটানি ছিল; কাজেই রাজস্ব-বৃদ্ধির দিকে তাঁহাদিগের সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টি থাকিত। রাজার রাজকোষ পূর্ণ হয় প্রজার রোজগারে। প্রজা তাহার নিজের আয়ের কতক অংশ রাজাকে কর দেয়; কারণ রাজা

ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা দেশে শান্তি রক্ষা না করিলে প্রজা নির্ব্বিঘ্নে কৃষিকার্য্য বা বাণিজ্য করিতে পারে না। সুতরাং রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে দুই উপায়ে;—(১) প্রজার কর বাড়াইয়া; ও (২) দেশের অর্থ-সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া। দেশের অর্থ-সম্পদ্ ও প্রজার আয়ের পরিমাণ বাড়িলে রাজার প্রাপ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবেই; এবং আয়ের অনুপাতে প্রজার দেয় বাড়িবে না। সুতরাং দ্বিতীয় উপায়ে রাজস্ব-বৃদ্ধির চেষ্টায় প্রজার অসন্তোষের কোনই কারণ নাই; রাজা-প্রজা উভয়েরই ইহাতে লাভ। রাজস্ব-বৃদ্ধির ইহাই প্রকৃষ্টতম পন্থা। প্রথম উপায়েও রাজস্ব-বৃদ্ধি করা যায় বটে; কিন্তু তাহার পরিণাম কখনই শুভ হয় না। আয়ের বেশীভাগ রাজকোষে দিতে হইলে, স্বভাবতঃই প্রজা অসন্তুষ্ট হয়। আবার আয় না বাড়িয়া কেবল করের হার বৃদ্ধি হওয়াতে, প্রজার গৃহে দারিদ্র্য প্রবেশ করে। সুতরাং প্রজার অর্থার্জ্জন-শক্তিও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পায়, এবং সেই সঙ্গে রাজার প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণও কমিয়া যায়। ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মচারীরা বঙ্গদেশে হঠাৎ রাজস্বের পরিমাণ জোর করিয়া বাড়াইতে যাইয়া এইরূপে ঠকিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের জুলুমের ফলে দেশে অশান্তি ও অনশনের আবির্ভাব হইল; এবং ঠেকিয়া শিখিয়া, অনেক লোকসান দিয়া, তবে তাঁহারা স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের পরামর্শে এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বাজীরাও ব্যতীত আর কোন

পেশবাই প্রথম পথে পা দেন নাই। তাঁহারা নিজেদের অর্থাভাব ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন দ্বিতীয় উপায়ে। দেশের সম্পদ্-বৃদ্ধির দিকে তাঁহাদের এত প্রখর দৃষ্টি ছিল যে, তাঁহারা অনেক সময়ে আশু লাভের লোভ সম্বরণ করিতেন ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায়। তাই তাঁহারা, শহরে একটি নূতন পেঠ বা বাজার বসাইতে হইলে, পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যে একটি পয়সাও হাশীল আদায় করিতেন না। পাঁচ-সাত বা ততোঽধিক বৎসর পরে বাজারটি বেশ জমিলেও, তাঁহারা তখনই-তখনই পূরাপূরি খাজনা আদায়ের চেষ্টা করিতেন না। ইস্তাবা রীতি অনুসারে ক্রমে ক্রমে খাজনা বাড়াইয়া, আরও পাঁচ-সাত বৎসর পরে সর্ব্বোচ্চ হারে খাজনা আদায় করিতেন। এইরূপে পতিত জমির আবাদ করিতে যাইয়াও, প্রথম আট-দশ বৎসর আবাদকারী প্রজার নিকটে একটি পয়সাও দাবী করিতেন না। তারপর যখন কর ধার্য্য হইত, তখন আবাদকারী অতি অল্প খাজনায় জমি ভোগ-করিতে পাইত; অধিকন্তু, তাহাকে কয়েক বিঘা একেবারে নিষ্কর দেওয়া হইত। দেশে শান্তি ছিল না; এখনকার মত শান্তি অব্যাহত রাখিবার উপায়ও ছিল না; সুতরাং পেশবা-সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন না। জমি পরিদর্শন করিয়া, ফসলের অবস্থা দেখিয়া, প্রজার সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গ্রাম্য-সমিতির কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, খাজনার হার নির্দ্ধারণ করা হইত। বিনা পরিদর্শনে খাজনা বাড়াইবার উপায় ত ছিলই না: আবার, অজন্মার সময়ে,—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অশান্তি ও

উপদ্রবের সময়ে প্রজারা অল্প সুদে পেশবা-সরকারের নিকট বা সরকারী কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে 'তগাই' ঋণ পাইত। সে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা ছিল কিস্তিবন্দীর হিসাবে। কৃষির উন্নতির ও বিস্তারের জন্য যেমন এইরূপ বিবিধ ব্যবস্থা ছিল, তেমনি দেশে নব-নব শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্যও, শিল্পীদিগকে কর হইতে অব্যাহতি দিয়া, অল্প হারে ঋণ দিয়া, তাহাদের শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিয়া উৎসাহিত করা হইত। তাই মহারাষ্ট্র-দেশ ইংরেজ কর্ত্তৃক বিজিত হইলে, সেনাপতি ওয়েলিংটন দেখিতে পাইয়াছিলেন, দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের প্রজার অবস্থা, কৃষির অবস্থা বৃটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির প্রজা ও কৃষির অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল, অনেক উন্নত। ভিন্সেণ্ট স্মিথ জোর করিয়া তাহাদিগকে চোর, লুটেড়া বলিয়া বড় গলায় গালি দিয়াছেন বটে, কিন্তু ওয়েলিংটনের সেই লেখা অথবা মনরোর সাক্ষ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে এখনও কিছু সময় লাগিবে, আয়াসের প্রয়োজন হইবে।

১

রাজস্বের শ্রেণীবিভাগ

পেশবা-সরকারের রাজস্ব মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল :—

১। ভূমিকর ও খাসমহলের আয়।

২। আমদানী, রপ্তানী ও আয়কর।

৩। জঙ্গল-বিভাগের আয়।

৪। টাঁকশালের আয়।

৫। আদালতের আয়।

খাসমহল সম্বন্ধে বেশী বলিবার নাই। খাসমহলের অধিকাংশ জমিতে শস্য উৎপন্ন হইত। সাধারণতঃ এই জমিগুলি 'উপরি' প্রজাগণের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত সরকারী প্রয়োজনে কতকগুলি জমি খাসের জন্য রাখা হইত, ইহার নাম 'কুরণ'। বর্ষাগমে মারাঠা-সৈন্য নিজেদের দেশে আসিয়া ছাউনী করিত ; তখন তাহাদের অশ্বের জন্য যথেষ্ট ঘাসের প্রয়োজন হইত। আবার পেশবার কোন বিশিষ্ট অতিথি আসিলে, তাঁহার সঙ্গের অশ্ব ও অশ্বারোহী সেনার থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইত। এই জন্য খাস-মহলের কতকগুলি জমি সরকারের প্রয়োজনীয় তৃণ জন্মাইবার জন্যই আলাদা করিয়া রাখা হইত। এতদ্ব্যতীত সাধারণ সব্‌জী-বাগান ও ফলের বাগান করিবার উপযোগী জমিও খাসমহলে থাকিত। এই সকল জমির বন্দোবস্তের

ভার ছিল পরগণার কামাবিস্‌দারের উপর। মোটের উপর খাসমহল হইতে পেশবা-সরকারের বড় বেশী আয় হইত না।

একালের মত সেকালেও কৃষিই ছিল দেশের অধিকাংশ লোকের প্রধান উপজীবিকা; সুতরাং, ভূমিকর হইতেই পেশবা-সরকারের বেশী অর্থাগম হইত। ভূমিকর সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, গ্রামে-গ্রামে কেমন করিয়া খাজনা আদায় হইত, গ্রাম হইতে আদায়ী খাজনা কেমন করিয়া পরগণায় চালান করা হইত, তাহার সম্বন্ধে তু-একটি কথা বলিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রামের খাজনা-আদায়ের ভার ছিল পাটীল ও কুলকর্ণীর উপর। খাজনা-আদায়ের সময় উপস্থিত হইলে, মহার গ্রামবাসিগণকে পাটীলের আফিস-ঘরে ডাকিয়া আনিত। সেখানে উপস্থিত থাকিতেন পাটীল স্বয়ং, কুলকর্ণী এবং পোতদার। কুলকর্ণী হিসাবের দপ্তর খুলিয়া সকলের দেনার পরিমাণ বলিয়া দিতেন। পোতদার খাজনার প্রত্যেকটি টাকা বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া গণিয়া লইতেন। পোতদারের পরীক্ষা ও গণনা শেষ হইলে কুলকর্ণী আদায়ী টাকার রসিদ লিখিয়া দিতেন। এইরূপে খাজনা-আদায় শেষ হইয়া গেলে, টাকাগুলি একটি থলিয়ায় পূরিয়া হিসাব সমেত, চৌগুলার মারফতে কামাবিস্‌দারের নিকট পাঠান হইত। ঐ হিসাবেরই একখানি নকল আবার মহারের মারফতে দেশমুখের নিকট যাইত। চৌগুলা কামাবিস্‌দারের নিকট হইতে একখানি লিখিত রসিদ লইয়া আসিত। কুলকর্ণী ঐ রসিদখানিকে সযত্নে

নিজের দপ্তরে রাখিয়া দিতেন। কখন কখন খাজনা-আদায়ে সাহায্য করিতে পরগণার কর্ম্মচারীর নিকট হইতে শিবন্দী ফৌজও গ্রামে আসিত। সাধারণতঃ চার বা তিন কিস্তিতে খাজনা আদায় করিবার রীতি মহারাষ্ট্রের পল্লীতে প্রচলিত ছিল।

এইখানে রাজস্ব-সম্পর্কীয় গুটিকয়েক শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত মনে করি। এই ব্যাখ্যার জন্য আমি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের নিকট ঋণী। ভারত ইতিহাস-সংশোধক মণ্ডলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সর্দ্দার খণ্ডেরাও চিন্তামণ মেহেন্দলে আমাকে বলিয়াছেন যে, হুজুর-দপ্তর ও রাজস্ব-বিভাগের কার্য্যাবলী-সম্বন্ধীয় একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি তাঁহার নিকটে আছে। ঐ পুঁথিখানিতে এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের রিপোর্ট অপেক্ষাও অনেক বেশী জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে এই অত্যাবশ্যক গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সুযোগ সৌভাগ্য আমার অদ্যাবধি ঘটে নাই।

আজকাল য়ুরোপীয় জাতিরা আফ্রিকা ও এসিয়ার অসভ্য অর্দ্ধসভ্য (অবশ্য য়ুরোপীয় হিসাবে) জাতিদিগের দেশ করায়ত্ত করিয়াছেন peaceful penetration বা আপোশে প্রবেশ করিয়া। অর্থাৎ প্রথম যখন সাদা পাদ্রী ও সাদা বণিক্ খ্রীষ্টের সুসমাচার ও য়ুরোপের পণ্য লইয়া এই অসভ্য জাতিগুলির অরণ্য-নিবাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে মানোয়ারী জাহাজও ছিল না, বন্দুক, কামান, সঙ্গীন, গোলাগুলি প্রভৃতি কোনও যুদ্ধের সরঞ্জামও ছিল না। সুতরাং,

ঐ সকল অসভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য জাতি এ কথা প্রথমে বুঝিতেই পারে নাই যে, আজ যাহাদের নিকটে তাহারা খ্রীষ্টের প্রেম-মাহাত্ম্য শুনিতেছে, যাহাদের নিকট হইতে গজদন্তের বিনিময়ে পিতলের তার ও তামার গিল্টি-করা গহনা কিনিতেছে, কিছুদিন পরে তাহাদেরই প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইবে; এবং সেই প্রভুত্ব বেশ পাকা করিয়া স্থাপন করিবার জন্য সাদা যাজক বা সাদা বণিকের পশ্চাতে রক্ত চক্ষু ও ততোঽধিক রক্তবর্ণ অগ্নিগোলক লইয়া সাদা সিপাহী আসিয়া কালার রাজ্যে প্রচণ্ড বিপ্লব বাধাইবে। সুতরাং peaceful penetration-এর প্রকৃত অর্থ গোড়ায় বুঝিতে অনেকেই অশক্ত হইয়াছিল। কিন্তু মারাঠারা যে উপায়ে আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ভিতরে আপোশের নামগন্ধও ছিল না। শিবাজী বা পেশবাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে, মোগল বাদশাহ্ বা মোগল সেনাপতিদিগের ত কথাই নাই, বোধ হয়, কোন নিরক্ষর মুসলমান কৃষকেরও কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই। শিবাজী তাঁহার বর্গি-সেনা লইয়া এক-এক শহরের নিকট উপস্থিত হইয়া সোজা কথায় বলিয়াছেন,—হয় আমাকে 'সরদেশমুখী' দাও, নয় ত তোমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিব। এ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই ধনী, দরিদ্র সরদেশমুখী দিয়া সর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু শিবাজী কেবল সরদেশমুখী বা রাজস্বের দশম অংশ লইয়াই অধিক দিন সন্তুষ্ট রহিলেন না। মুসলমানদের সহিত তাঁহার নিত্য কলহ; তাঁহার পার্ব্বত্য রাজ্য সাহস ও বীর্য্য-সম্পদে যতই সম্পন্ন হউক না কেন, অর্থ-

সম্পদে বিরাট মোগল-সাম্রাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে একান্ত অক্ষম। তাই শিবাজী শত্রুর রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া শত্রুর অর্থে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। যুদ্ধ যতই চলিতে লাগিল, ততই তাঁহার অর্থাভাবের সহিত আত্মশক্তিতে প্রত্যয় বাড়িল। তিনি এত দিন সরদেশমুখী বা রাজস্বের দশমাংশ আদায় করিতেছিলেন; এখন চৌথ বা রাজস্বের চতুর্থাংশ দাবী করিলেন এবং আদায়ও করিতে লাগিলেন। চৌথের সমস্ত টাকাটা কিন্তু বরাবর রাজকোষে যাইত না। চৌথ আদায় করিতেন ছত্রপতি মহারাজের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ পেশবা, পন্ত-সচিব প্রভৃতি। ইঁহারা চৌথের এক-চতুর্থাংশ মাত্র রাজকোষে দিতেন;—ইহার নাম 'বাবতী'। বাকী তিন-চতুর্থাংশের নাম 'মোকাশা'। 'মোকাশা' সাম্রাজ্যের বড় বড় সেনাপতিরা ভোগ করিতেন। এই অর্থে তাঁহাদের সেনা বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। সমগ্র 'মোকাশা' কিন্তু সর্দ্দারেরা পাইতেন না; কারণ, সমগ্র 'চৌথের' 'সহোত্রা' বা শতকরা ৬৲ পন্ত-সচিবের প্রাপ্য ছিল। সুতরাং চৌথের শতকরা ৬৯৲ টাকা মাত্র, মোকাশাদারদিগের মধ্যে বিভক্ত হইত। সরদেশমুখীও কালক্রমে এইরূপে রাজা ও তাঁহার সেনানায়ক-দিগের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে যখন সমস্ত দেশটাই দস্তুর মত মারাঠা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল, তখন 'চৌথ' ব্যতীত বাকী রাজস্বও পেশবাদিগের হস্তগত হইল। এই তিন-চতুর্থাংশের নাম দেওয়া হইল 'জাগীর'। সমগ্র রাজস্ব এইরূপে 'সরদেশমুখী,' ও 'চৌথ,' 'বাবতী', 'মোকাশা' ও

'সহোত্রা' এবং 'চৌথ' ও 'জাগীরে' বিভক্ত হইল। বিভাগের প্রণালীটা একটু জটিল। এল্‌ফিনষ্টোন্ সাহেব নিম্নলিখিতরূপে অঙ্ক দিয়া সরল করিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মনে করুন, কোন প্রদেশের সমগ্র রাজস্বের পরিমাণ··· ··· ৪০০৲

তাহা হইলে সরদেশমুখী হইবে ৪০৲

সরকারী রাজস্ব··· ··· ··· ৪০০৲

চৌথ ··· ··· ··· ··· ১০০৲

জাগীর ··· ··· ··· ··· ৩০০৲

চৌথের মধ্যে আবার—

বাবতী ··· ··· ··· ··· ২৫৲

মোকাশা ··· ··· ··· ··· ৭৫৲

মোকাশা আবার সহোত্রা ও ঐন মোকাশায় বিভক্ত—

সহোত্রা ··· ··· ··· ··· ৬৲

ঐন মোকাশা ··· ··· ··· ৬৯৲

মোট—৭৫৲

বলা বাহুল্য যে, রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জায়গীরদার ও ইনামদারের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। সুতরাং, সর্দ্দারদিগকে কেবল মোকাশা দিয়া আর সম্যকরূপে প্রতিপালন করা সম্ভবপর রহিল না। বিজিত রাজ্যের রাজস্বের 'জাগীর' অংশ হইতেও তাহাদিগকে ইনাম দিতে হইল।

এইভাবে একই গ্রামের রাজস্বের বিভিন্ন অংশের অনেক পাওনাদার জুটিয়া গেল। কেহ হয় ত সহোত্রা দাবী করিলেন। কেহ হয় ত মোকাশার এক-চতুর্থাংশের পাওনাদার। মোকাশার

বাকী ১/৪ অংশ আর সাত জনকে ইনাম দেওয়া হইয়াছে। আবার 'জাগীরের' কতক অংশে আর দশ জনের দাবী আছে। রাজস্বের সকল মালিকই যদি ভিন্ন ভিন্ন তহশীলদার নিযুক্ত করিতেন, তবে বোধ হয় অসুবিধা ও অত্যাচারের চূড়ান্ত হইত। কিন্তু সাধারণতঃ আদায়ের ভার একজন ইনামদারের উপর থাকিত। আদায়ের কাজটা তিনিই করিতেন; যথাসময়ে অন্যান্য অংশীদিগকে তাহাদের ন্যায্য পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিলেই চলিত।

২

রাজস্ব-নীতি

এইবার পেশবাদিগের রাজস্ব-নীতির কথা আলোচনা করিব। এখনকার মত সে কালেও মহারাষ্ট্রের তথা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেরই প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। সুতরাং কৃষির উন্নতি ও বিস্তার ব্যতীত দেশের ধনবৃদ্ধির ও রাজার রাজস্ব-বৃদ্ধির উপায় ছিল না। এই জন্য পেশবা-সরকার প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, তাহাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কৃষিবিস্তারের চেষ্টা ও রায়তের সন্তোষ বিধান। তাহাদিগকে রাজস্বের হার স্থির করিতে হইত, আবাদী জমি ভাল করিয়া জরিপ করিয়া, ফসলের অবস্থা বিশেষভাবে পরিদর্শন করিবার পর। এই সাধারণ রাজস্ব-নীতির উদাহরণ কয়েকখানি প্রাচীন দলিল হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বহিরো রাম নামক এক ব্যক্তি রেওদণ্ডার মাম্‌লত্‌দার নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগপত্রে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছিল যে, তাঁহার এলাকায় নারিকেল বাগানের তৎকালীন বৃক্ষ-সংখ্যা গণনা করিয়া প্রতি বৎসর পাঁচটি নূতন চারা লাগাইতে হইবে। ১৭৪৭ সালের একখানি দলিলে প্রাপ্ত রাজপুরীর শাসনকর্ত্তা নারোত্রিম্বককে বলা হইতেছে যে, ৫ বৎসরের মধ্যে কৃষির জন্য ক্রীত বলদ বা মহিষের জন্য রায়তদিগের নিকট হইতে কোন কর আদায় করা হইবে না। ১৭৬০ সালে বনিদিগোরির মাম্‌লত্‌দার আপ্পাজী হরির নিয়োগপত্রে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি তাঁহার বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।

১। বনিদিগোরি এলাকার গ্রামগুলি জরিপ করিতে হইবে। তথাকার সমুদয় জমি উর্ব্বরতা অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে ভাগ করিতে হইবে, এবং জলসেচনের প্রণালী অনুসারে ও উৎপন্ন শস্যের প্রকৃতি অনুসারে পাটস্থল, মোটস্থল, জিরাইত ও বাগাইত, এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া তাহাদের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। এই জরিপের ফলাফল আমিনের গোচর করিলে আমিন দেয় রাজস্বের হার নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন; তদনুসারে রাজস্ব আদায় হইবে।

২। দুই তিন বৎসরের মধ্যে পরগণার অনাবাদী জমি আবাদ করিতে হইবে। না করিলে কামাবিস্‌দারের চাকরী থাকিবে না।

৩। শস্য না হইলে অথবা দেশে অশান্তি উপদ্রব হইলে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে খাজনা রেহাই দেওয়া হইবে।

বাস্তবিক কৃষির উন্নতি বিধানের দিকে পেশবাদিগের এমন ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন ছিল যে, তাঁহারা এই নিমিত্ত আধুনিক সময়ে প্রচলিত কোন উপায় অবলম্বন করিতেই পরাঙ্মুখ হন নাই। যাহাতে জমির প্রতি প্রজাদের একটা মমতা জন্মে, যাহাতে জমির উন্নতি-সাধনের দিকে একটা আগ্রহ জন্মে, এই জন্য পেশবা-সরকার সাধারণতঃ পাঁচ হইতে সাত বৎসরের কড়ারে দীর্ঘকালের জন্য জমি বিলি করিতেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা কখন কখনও চাষের জমির বন্ধক বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন। পেশবা দ্বিতীয় মাধবরাওয়ের সময়ের দুইখানি দলিল হইতে শেষোক্ত নিয়মের দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

১৭৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রান্ত গুজরাটের অন্তর্গত আমোদ পরগণার মাম্‌লত্‌দার রঘুনাথ হরি পদচ্যুত হন এবং তাঁহার পদে মহাদেও নানা শেঠ নামক এক ব্যক্তি মাম্‌লত্‌দার নিযুক্ত হন। নবনিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের নিয়োগপত্রেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের তালিকা দেওয়া হইত। মহাদেও নানা শেঠের কর্ত্তব্যের তালিকার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

১। অনাবাদী পতিত জমি আবাদ করিতে হইবে এবং প্রতিবৎসর চাষ-আবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সরসুভার নিকট দাখিল করিতে হইবে। চাষ-আবাদের সময় রায়তদিগকে 'তগাই' দিবে ও সরসুভার নির্দ্দেশমত কার্য্য করিয়া যাইবে। ইহার অন্যথা করিও না।

২। আমোদ পরগণার জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে অনেক অনুচিত কর আদায় করে বলিয়া প্রকাশ। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অন্যায় করের পরিমাণ সম্বন্ধে হুজুরে রিপোর্ট করিবে।

৩। পরগণার মধ্যে যে সমস্ত চাষের জমি বিক্রয় করা হইয়াছে ও বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিক্রয় ও বন্ধক রদ করিয়া পুনরায় কৃষকদিগকে ফিরাইয়া দিবে। ভবিষ্যতে এই প্রকারের জমির বিক্রয় ও বন্ধক চলিবে না।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে গুজরাট প্রান্তের আর একটি পরগণার পুরাতন শাসনকর্ত্তা সখারাম শেষাদ্রির স্থলে শিদো তুকোদেব নামক একজন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ-পত্রেও তাঁহাকে চাষ আবাদের দিকে ও জমিদারদিগের অন্যায় উৎপীড়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১। ইস্তাবার কড়ার অনুসারে যাহাতে চাষ-আবাদ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে ও চাষ-আবাদের অবস্থা প্রতি বৎসর সরসুভার গোচর করিবে। যদি ইস্তাবা কড়ারের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কম রাজস্ব আদায় হয়, তবে কামাবিস্‌দারকেই সরকারের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।

২। ঐ পরগণার জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে অতিরিক্ত কর আদায় করে বলিয়া প্রকাশ। ঐ বিষয়ে তদন্ত করিয়া সরসুভার নিকট রিপোর্ট করিবে।

৩। ঐ পরগণার চাষের জমি, যাহা বন্ধক বা বিক্রয়

হইয়াছে, তাহা আবার চাষী প্রজাকে ফিরাইয়া দিবে। ভবিষ্যতে আর চাষের জমি বিক্রয় করা বা বন্ধক রাখা চলিবে না।

ইংরাজ আমলে পাঞ্জাব-সরকার চাষের জমির বন্ধক ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই যে পেশবা-সরকার কৃষির উন্নতি-কল্পে গুজরাট প্রদেশের কোন-কোন পরগণায় এই নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা কি বাস্তবিকই তাঁহাদের দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে? আরও একটি কথা এই স্থলে আমাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই সকল নিয়োগ-পত্রের নিয়ম অনুসারে কৃষি-বিস্তার বা কৃষির উন্নতি-সাধন যে কেবল কামাবিস্‌দারের বা মাম্‌লত্‌দারের অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মই, তাহা নহে; উহার সহিত তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থেরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ। কারণ, অনাবাদী জমির চাষ না হইলে, কামাবিস্‌দারের চাকরী থাকিবে না। ইস্তাবা কড়ারের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইতে কম রাজস্ব আদায় হইলে, সরকারী লোকসানের পূরণ করিতে হইবে—কামাবিস্‌দারের নিজের তহবিল হইতে। সুতরাং কর্ত্তব্য-বোধের সহিত যেখানে ব্যক্তিগত ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান, সেখানে কামাবিস্‌দার ও মাম্‌লত্‌দারেরা যে অনুক্ষণ পেশবা-সাম্রাজ্যের কৃষি-বিস্তারের প্রতি অবহিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

৩

পাহনী বা পরিদর্শন

কৃষি-বিস্তারের দিকে পেশবা-সরকারের এত মনোযোগী হইবার কারণ, কৃষির অবস্থা দেখিয়াই রাজস্বের হার নির্দ্দিষ্ট করা হইত। বিনা পাহনীতে, বিনা পরিদর্শনে খাজনা ঠিক করিবার উপায় ছিল না। প্রত্যেক বৎসরই বিভিন্ন পরগণার চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিতে, আবাদী জমি জরিপ করিতে, অনেক পাহনীদার বা পরিদর্শক প্রেরিত হইত। অনেক পুরাতন মারাঠী দলিলে তাহাদের কর্ত্তব্যের বিবরণ ও বেতন এবং ভাতা-সম্বন্ধীয় বহু তথ্য পাওয়া যায়। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি কাগজে পাহনীদারদিগের বেতন ও সহকারী-দিগের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়ঃ—

যে সকল পাহনীদারকে জিরাইত জমি দেখিতে পাঠান হইয়াছে—

যাহাদিগকে তরফ নাগঠণের জমি পরিদর্শন করিতে পাঠান হইয়াছে, তাহাদিগকে পাহনীর কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি মাসে রাঘো বল্লাল আমীন ৮৲, হরি বালাজী কারকুন ৮৲, একুন ১৬৲ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। লিখিবার জন্য সাদা কাগজ এবং দপ্তর বাঁধিবার কাপড় দেওয়া হইয়াছে।

তরফ পালীর পাহনীর নিমিত্ত একমাস কাজ হওয়ার পর পাহনীর কাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত উপরিলিখিত তরফের হবালদার রামজী বাবাজীর নিকট হইতে দেওয়া হইয়াছেঃ—

নারো বল্লাল আমীন মাসিক ৮৲
কেশো মোরেশ্বর কারকুন " ৭৲
একুন ১৫৲ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

হোনাজী বালকবড়ের অধীনস্থ দুইজন সিপাহী, একজন জরিপের পিয়াদা, একুন তিনজন লোক এবং লিখিবার উপযুক্ত সাদা কাগজ এবং দপ্তর বাঁধিবার কাপড় দেওয়া হইয়াছে।

বাগাইত জমির খাজনাও পাহনীর পর ঠিক হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেয় করের হার অতিরিক্ত বা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিলেই, গ্রামের লোকের প্রতিনিধি হিসাবে পাটীল পাহনী বা জমি পরিদর্শনের নিমিত্ত আবেদন করিতে পারিত। কালক্রমে এই প্রথা কতকটা প্রজার ন্যায় ও আইন-সঙ্গত অধিকারে পরিণত হইয়াছিল; এবং রাজা ও প্রজা কতকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল যে, ফসলের অবস্থা পরিদর্শন না করিয়া খাজনার হার বৃদ্ধি করিবার উপায় নাই। পেশবা দ্বিতীয় মাধবরাওয়ের আমলে একবার কল্যাণভিবণ্ডির শাসন-কর্ত্তা সরকারে নিবেদন করিয়াছিলেন যে, জমি পাহনী না হওয়াতে, তাঁহার এলাকার জমাবন্দী হইতে পারে নাই। পাহনীদারদিগের রাহা-খরচ ও খোরাকীর জন্য প্রায় ৭০০৲-৮০০৲ টাকার দরকার। সরকার হইতে তিনি উত্তর পাইয়াছিলেন যে, প্রজাগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার না করিয়া, যথাযথ ভাবে পরিদর্শনের পর, খাজনার হার বৃদ্ধি করিয়া যদি অর্থলাভের আশা থাকে, তাহা হইলে পাহনীদারগণের খোরাকী খরচ বাবদ ৪০০৲-৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

এই একখানি দলিল হইতেই বোধ হয়, মারাঠা-সাম্রাজ্যে ফসল-পরিদর্শনের পর জমাবন্দী স্থির করিবার প্রথা সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

৪

খাজনার হার

বাস্তবিক, বিনা পরিদর্শনে মারাঠা-সাম্রাজ্যে জমির কর ঠিক করা একেবারে অসম্ভব ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উর্ব্বরতার হিসাবে, ফসলের প্রকৃতি অনুসারে, জল-সেচনের প্রণালী-ভেদে, মারাঠা-পল্লীর কৃষিক্ষেত্র বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। এই বিভিন্ন শ্রেণীর জমির করের হারও বিভিন্ন ছিল। তাহার পর বহুদিনের পুরাতন আবাদী জমির জন্য যে হারে কর দাবী করা হইত, নূতন আবাদী জমির জন্য প্রজাদিগকে তাহা অপেক্ষা অনেক নিম্নতর হারে কর দিতে হইত। আবার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের ফসলের জমির জন্য করের হারও ছিল বিভিন্ন। বালাজী বাজীরাও পেশবার শাসনকালীন একখানি দলিলে ১৭৪০-৪১ সালে তরফ হাবেলী পালের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষিক্ষেত্রের দেয় করের নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া গিয়াছে—

১। ধানের জমির বিঘা-প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ১০ মণ করিয়া শস্য।

২। ইক্ষু-ক্ষেত্রের বিঘা প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ৫৲।

৩। সব্‌জী-ক্ষেত্রের বিঘা-প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ২৲।

৪। যে সকল জমিতে রবিশস্য জন্মে, তাহার বিঘা-প্রতি খাজনা ১৷৹।

বালাজী বাজীরাওয়ের সময়েই বাই-প্রান্তের অন্তর্গত কঠপুর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর জমির কর নিম্নলিখিত হারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—

প্রথম	শ্রেণীর	জমি	প্রতি	বিঘা	৩১/২ মণ	১	পায়লী
দ্বিতীয়	”	”	”	”	২১/২ ”	২	”
তৃতীয়	”	”	”	”	১৩/৪ ”	।৹	”

(১ পায়লী = ৪ সের)।

এই পেশবার সময়ের আর একখানি দলিল হইতে (তারিখ ১৭৪৯-৫০) উর্ব্বর কালো জমির ও অনুর্ব্বর পাহাড়ী জমির এবং নূতন আবাদী ও পুরাতন আবাদী জমির করের হারের পার্থক্য দেখা যাইবে। এই খাজনার হার ১৭৫০ সালে চিন্দ-ওয়ার পরগণায় পিম্পল গাঁও গ্রামে প্রচলিত ছিল—

১। পুরাতন আবাদী কালো জিরাইত জমি প্রতি বিঘা ২৲

. পুরাতন আবাদী পাথুরে জমি প্রতি বিঘা ১৲

নূতন আবাদী জমির খাজানা ইস্তাবা রীতি অনুসারে নিম্নলিখিত হারে আদায় হইবে—

কালো জমি	প্রতি বিঘা
১ম বৎসর	।৹
২য় বৎসর	৷৷৹
৩য় বৎসর	১৲
৪র্থ বৎসর	১৷৷৹
৫ম বৎসর	২৲

পাথুরে জমি	প্রতি বিঘা
১ম বৎসর	৵০
২য় ”	।০
৩য় ”	।।০
৪র্থ ”	৸০
৫ম ”	১৲

২। পুরাতন আবাদী বাগাইত জমি, যাহাতে ইক্ষু বা ঐ প্রকারের লাভজনক ফসল জন্মে—বিঘা প্রতি ১০৲।

নূতন আবাদী পতিত জমির (যাহাতে খালের জল সেচন করিয়া ফসল জন্মান যাইতে পারে) কর ইস্তাবা রীতিতে নিম্নলিখিত হারে আদায় হইত—

১ম বৎসর	প্রতি বিঘা	৫৲
২য় ”	” ”	৬৲
৩য় ”	” ”	৭৲
৪র্থ ”	” ”	৮৲
৫ম ”	” ”	১০৲

যে সমস্ত জিরাইত জমি, জল-সেচনের নিমিত্ত কূপ প্রভৃতি খনন করিয়া, বাগাইতের ফসল-উৎপাদনের উপযোগী করা হইত, তাহার খাজনার হার নিম্নলিখিত রূপ :—

১ম বৎসর	প্রতি বিঘা	১৲
২য় ”	”	২৲
৩য় ”	”	৩৲
৪র্থ ”	”	৪৲
৫ম ”	”	৫৲

এতদ্ব্যতীত বাগাইত জমির ফলবান্ আম্রবৃক্ষের জন্য

আলাদা কর দিতে হইত। আম গাছের ফলন আরম্ভ হইলে, প্রত্যেক হাজার ফলের জন্য সরকারে ১৲ খাজনা দিতে হইত।

এই দলিলখানির শেষের দিকে পেশবা-সরকারের কর্ম্মচারী-দিগকে বলা হইয়াছে যে, গ্রাম্য-জমির প্রায় এক-দশমাংশ পতিত ও অনাবাদী রহিয়াছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এই পতিত জমির আবাদ হওয়া চাই। এই দলিলখানি হইতেই বুঝিতে পারা যায়, পেশবা-সরকার কেমন করিয়া কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিতেন, কৃষকের হিত সাধন করিতেন, এবং অন্যায় ভাবে খাজনার হার বৃদ্ধি না করিয়াই, জমির বর্দ্ধিত আয়ের অংশ, ইংরাজীতে যাহাকে unearned increment বলে, ভোগ করিতেন। ফসল-ভেদে কিরূপে খাজনার হারের তারতম্য হইত, তাহার উদাহরণ প্রথম মাধব রাওয়ের সময়ের ১৭৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের একখানি দলিল হইতে দিতেছি। দলিলে লিখিত খাজনার হার ঐ সময়ে নেরাল তালুকে প্রচলিত ছিল—

প্রথম শ্রেণীর জমির	প্রতি বিঘা	৫৲
২য় ” ”	” ”	৪৲
৩য় ” ”	” ”	৩৲
রবি শস্যের জমি	” ”	১।০
বরকস* জমি	” ”	১৷৷০
শণের জমি	” ”	৫৲
ইক্ষু-ক্ষেত্র	” ”	৫৲
তাল	গাছ প্রতি	।০
নারিকেল	” ”	৷৷০

* ধান্য ব্যতীত গম যব প্রভৃতি শস্যকে ‘বরকস’ বলে।

৫

খাজনা টাকায় ও শস্যে

এই দলিলগুলি হইতেই দেখা যায় যে, প্রজার সুবিধামত উৎপন্ন শস্যে অথবা নগদ টাকায় খাজনা আদায় করা হইত। পেশবা-সরকার চাহিতেন উৎপন্ন শস্য,—নগদ টাকা দেওয়াই ছিল প্রজাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক। তাই প্রজারা প্রায়ই খাজনার বদলে খাজনার পরিমাণ টাকায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য আবেদন করিত; আর সে আবেদন প্রায় কখনই অগ্রাহ্য হইত না। কিন্তু অনেক সময়ে পেশবা-সরকার কামাবিস্‌দারকে শস্যই আদায় করিতে বলিতেন; এবং সাধ্যপক্ষে টাকা আদায় করিতে নিষেধ করিতেন। ১৭৪৪ সালের একখানি দলিলে জিলা-মাবলের শাসনকর্ত্তা নারো রামচন্দ্রকে খাজনা টাকায় আদায় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু সেই সঙ্গেই আবার বলা হইয়াছে যে, যদি শস্য দিতে প্রজারা একেবারে অপারগ হয়, তবে তাহাদের নিকট হইতে টাকাই লইও; এবং টাকায় খাজনার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পেশবা-সরকার হইতে নারো রামচন্দ্রকে সমস্ত শস্যের তখনকার বাজার-দরেরও একটা তালিকা পাঠান হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই তালিকা পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিতেছি—

চাউল	প্রতি মণ	১।০
নগলি	” ”	১॥০
ওয়ারি	” ”	১।০
তিল	৪ পায়লি	১৲
জোয়ারী	প্রতি খণ্ডি	৩৫৲
ছোলা	” ”	৪০৲
গম	” ”	৪০৲
ঘি	দুই সের	১/০

(১ খণ্ডি=২০ মণ)

ইহার পরের বৎসর রাজাপুরীর শাসনকর্ত্তা পূর্ব্ববৎসরের বাকী-খাজনা যথাসম্ভব শস্যেই আদায় করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অসমর্থ প্রজাকে দেয় রাজস্ব টাকায় পরিশোধ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। তবে রাজাপুরীতে চাউলের দর আরও সস্তা; প্রতি খণ্ডি বা বিশ মণের দাম ১৫৲ মাত্র।

ইহার এক বৎসর পরেই সদাশিব লক্ষ্মণের আবেদনে মালব-প্রান্তের প্রজাগণের সুবিধার জন্য, তাহাদের দেয় খাজনার শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য পেশবা-সরকার বাজার-দরের আর একখানি তালিকা প্রস্তুত করেন। তুলনা করিলে, এই তালিকার সহিত পূর্ব্ব তালিকার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এবারের তালিকায়,—

চাউল	প্রতি খণ্ডি	৩০৲
নগলি*	” ”	৩৫৲
ওয়ারি	” ”	৩০৲
তিল	” ”	৭০৲
জোয়ারী এবং বাজরী	”	৪৫৲
গম	” ”	৬০৲
ঘি	দুই সের	১৲

দুই বৎসর পরে নানে মাবল ও পাল মাবল তরফের প্রজাগণ নারো কেশবের অনুরোধে আবার বাকী রাজস্ব টাকায় পরিশোধ করিবার অনুমতি পায়। এবারেও তাহাদের জন্য সমস্ত জিনিসের আবার একটা মূল্য-তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। পাঠকের অবগতির জন্য সমগ্র দলিলখানির অনুবাদ দিতেছি।—“তরফ নানে মাবল ও পাল মাবলের প্রজাগণের নিকট দুই বৎসরে ৭০ খণ্ডি শস্য বাকী পড়িয়াছে। রাজশ্রী নারো কেশব হুজুরে আবেদন করিয়াছে যে, বাকী রাজস্বের কিয়দংশ টাকায় পরিশোধ করিবার অনুমতি দেওয়া হউক; এবং অপর অংশের আদায় আপাততঃ স্থগিত রাখা হউক। তদনুসারে ২০ খণ্ডি শস্যের পরিমাণ খাজনা টাকায় পরিশোধ করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। রবি শস্যের দাম টাকায় ৩ পায়লী, ডাল, নাচনা, বারি এবং চাউলের মূল্য টাকায় ৩ পায়লী হিসাবে ধরিবে।

* Cynosurus corocanus.

জ্যেষ্ঠ (প্রথম) মাধব রাওয়ের দপ্তরের একখানি দলিলে দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণেরা শস্যের খাজনা বাজার-দর অপেক্ষাও সস্তা দরে টাকায় দিবার জাতিগত অধিকার দাবী করিতেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তরফ টুঙ্গারতনের অন্তর্গত চান্তারসি গ্রামের অধিবাসী বালম্‌ভট গোডবোলে নামক ব্রাহ্মণ শস্যের পরিবর্ত্তে বিঘা-প্রতি ৫৵৬ হারে খাজনা ঠিক করিয়া লয়। পূর্ব্বোক্ত টাকার খাজনার হারের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনায় বালম্‌ভটের দেয় খাজনার নিরিখ বিশেষ অন্যায় মনে নাও হইতে পারে। কিন্তু বালাজী বাজীরাওয়ের দপ্তরের একখানি দলিল হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় যে আংগ্রিয়াদের আমলে টুঙ্গারতন তরফের প্রজাগণকে বিঘা-প্রতি দশ মণ হারে খাজনা দিতে হইত। আমরা পূর্ব্বে যে কয়েকটি বাজার-দরের তালিকা পাইয়াছি, তাহার কোন তালিকা অনুসারেই ১০ মণ শস্যের দাম ৫৵৬ হইতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রজাগণকে যে খাজনার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ পেশবাগণ বিশেষ খাতির করিতেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কল্যাণ প্রান্তের ব্রাহ্মণ প্রজাগণ আবার বেগার দিতেন না, ক্রীত জিনিসের হাসিল হইতেও তাঁহারা রেহাই পাইতেন। বিচারপতি রাণাডে সত্যই বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণদিগের প্রতি পেশবা-সরকারের এই পক্ষপাতিত্বের ফলে অব্রাহ্মণদিগের উপর খাজনার ভারটা একটু বেশী পরিমাণে চাপান হইয়াছিল; আর পরিশেষে এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতিত্বই পেশবা-সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উদ্ধৃত একখানি দলিলে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, পেশবা-সরকার একজন কামাবিস্‌দারকে নারিকেলের চাষের উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হইতে বলিয়াছেন। অপর দলিলে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক নারিকেল গাছ হইতে পেশবা-সরকারের বার্ষিক ॥০ আয় হইত। সুতরাং নারিকেল-বাগানের বৃদ্ধিতে পেশবা-সরকারের রাজস্ব-বৃদ্ধি; কিন্তু নারিকেল-বাগানের মালিককে অনেক টাকা খরচ ও বহু পরিশ্রম করিয়া বাগান প্রস্তুত করিয়া লাভের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। তাই পেশবা-সরকারও চারা গাছের উপর কর বসাইতেন না,—বাগানের মালিকের লাভের দিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। গাছের বয়স বিশ বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত পেশবা-সরকার নারিকেল গাছের উপর কর ধার্য্য করিতেন না। কেবল নারিকেল নহে, নারিকেলের মত যে সকল গাছ হইতে মালিকের আশু লাভের সম্ভাবনা নাই, সে সকল গাছের উপর কর ধার্য্য করিবার সময়ে এই নীতির অনুসরণ করা হইত। উদাহরণ একখানি পুরাতন দলিল হইতে দিতেছি।—

"যদি কেহ নিম্নলিখিত বৃক্ষ রোপণ করে, তবে বৃক্ষের পাশে লিখিত সময়ের মধ্যে তাহাকে এই সকল বৃক্ষের জন্য কোন কর দিতে হইবে না—

নারিকেলের জমির উর্ব্বরতা অনুসারে ১৮ বা ২০ বৎসর।

সুপারী গাছ	১৫ বৎসর।
উণ্ডনী বৃক্ষ	১২ বৎসর।

এই সময় অতীত হইলে নিম্নলিখিত হারে কর ধার্য্য হইবে—

নারিকেল গাছ প্রতি চারি আনা ও এক বোঝা শুকনা পাতা।

নারিকেল গাছ (যাহা হইতে তাড়ি তৈয়ারী হয়)
গাছ প্রতি ১৲ ও এক বোঝা পাতা।

সুপারী	গাছ প্রতি ⁄৹
উণ্ডনী	গাছ প্রতি ৶৹ ”

এই প্রকারে বিশেষ লাভজনক বৃক্ষ রোপণে কৃষককে উৎসাহিত করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

৬

পতিত জমির আবাদ

নূতন আবাদী জমির খাজনা খুব কম ছিল। কারণ অনুমান করা কঠিন নহে,—পেশবা-সরকার চাহিতেন, সকল পতিত জমি আবাদ হইয়া যাউক। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা অনেক সময়ে উদ্যোগী প্রজাগণকে বহু জমি ইনাম দিতেন। কনিষ্ঠ মাধবরাওয়ের আমলের একখানি দলিল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অঞ্জনবেল ও সুবর্ণদুর্গ তালুকের কোন-কোন পাহাড়ে অংশ চাষ আবাদের একেবারে অনুপযোগী ছিল। সেখানে না কি গাছ-পালা, ঘাস-তৃণ কিছুই জন্মিত না।

প্রকৃতির এই কার্পণ্য কিন্তু মারাঠা-কৃষক বা পেশবা-সরকার কাহাকেও নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। প্রজাগণ সরকারে আবেদন করিল যে, সরকার হইতে উপযুক্ত ইনামের আশা পাইলে, তাহারা পাহাড়ের চূড়া ভাঙ্গিয়া সমতল করিবে, মাটি আনিয়া নালা-ডোবা বুজাইয়া ফেলিবে, এবং অঞ্জনবেল ও সুবর্ণদুর্গের অনুর্ব্বর পাহাড় হরিৎ শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিবে। পেশবা-সরকারও এরূপ আবেদনের উত্তর দিতে বিলম্ব করিলেন না; প্রজাগণ জবাব পাইল—

১। যদি কেহ পাথুরে জমির উপর মাটি ছড়াইয়া, সেখানকার নালা-ডোবা ভরাট করিয়া, চারিদিকে বাঁধ বাঁধিয়া চাষের উপযোগী করিয়া তুলে, তবে আবাদী জমির অর্দ্ধেক তাহাকে ইনাম দেওয়া হইবে, বাকী অর্দ্ধেকও বিশ বৎসর কাল সে নিষ্কর ভোগ করিতে পাইবে। বিশ বৎসর পরেও পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত নিম্নতর হারে খাজনা দিবার পর তবে তাহার নিকট পূর্ণ কর দাবী করা হইবে।

২। যদি কেহ সমুদ্রের তীরে বাঁধ বাঁধিয়া চাষের উপযোগী জমি উদ্ধার করে, তবে তাহাকে ঐ জমির চতুর্থাংশ ইনাম দেওয়া হইবে। এবং তাহার পরিশ্রম ও ব্যয়ের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া, যতদিন উচিত বোধ হয়, বাকী জমি নিষ্কর ও অল্প খাজনায় ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।

বলা বাহুল্য, এই উপায়ে সুবর্ণদুর্গের ও অঞ্জনবেলের বহু পতিত জমি আবাদ হইয়াছিল,—সাগর-তীরে চাষের উপযোগী বহু জমির উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল।

৭

খাজনা রেহাই

পেশবা-সরকার কেবল যে পতিত জমির আবাদ করিবার জন্যই খাজনা রেহাই দিতেন, বা নিম্নতর হারে খাজনা লইয়া জমি বিলি করিতেন, তাহা নহে; পুরাতন আবাদী জমির উন্নতির দিকেও তাঁহাদের চেষ্টা যত্নের অবধি ছিল না। তাই তাঁহারা কৃষকের সুখ-দুঃখের কথা বিবেচনা করিয়া, আপদ্-বিপদ্, সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, খাজনার পরিমাণ স্থির করিতে চেষ্টা করিতেন। বহুদিনের পুরাতন পল্লীগুলিতেও কৃষির অবনতি লক্ষিত হইবামাত্রই আবার ইস্তাবাকরার প্রবর্ত্তিত হইত। কিন্তু সাধারণ কারণ ব্যতীতও, অনেক সময়ে আকস্মিক ও অসাধারণ কারণে পল্লী-কৃষকের অনিষ্টে কৃষির অনিষ্ট হইতে পারে। দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, শত্রুর উৎপাতে তাহাদের সময়-সময় এমন অনিষ্ট, এত ক্ষতি হইত, যাহার আশু প্রতিকার আবশ্যক। এরূপ ক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনা করিয়া পেশবা-সরকার বৎসরের খাজনা হয় সম্পূর্ণ, না হয় আংশিক রেহাই দিয়া দিতেন। বাকী কর প্রজার সুবিধা-মত-কিস্তিবন্দীর চুক্তিতে আদায় করিতেন। আর দিতেন অল্প সুদে বা বিনা সুদে তগাই ঋণ। তগাই ঋণের কথা একটু পরে বলিব। এখানে পুরাতন মারাঠা দলিল হইতে দেখা যাউক, কিরূপ অবস্থায় কি পরিমাণে, পেশবা-সরকার তাঁহাদের বিপন্ন প্রজাগণকে করভার হইতে অব্যাহতি দিতেন।

১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নানে তরফের অন্তর্গত কান্নু গ্রামে আগুন লাগিয়া গ্রামখানি পুড়িয়া যায়। গ্রামের লোকসংখ্যা কত, দেয় রাজস্বের পরিমাণ কি, তাহার উল্লেখ আমাদের দলিল-খানিতে নাই; কেবল এইটুকু জানা যায় যে, এই অগ্নিদাহে পল্লীবাসিগণের ক্ষতির কথা শুনিয়া পেশবা-সরকার আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের দেয় রাজস্বের মধ্যে সে বৎসর ১৷৹ খণ্ডি ২ মণ শস্য মাপ করা হইবে। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিজাগড় সরকারের অন্তর্গত বালকচড়া ও জালালাবাদ পরগণায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সরকার হইতে তগাই ঋণ দিয়া সাহায্য করা সত্ত্বেও অনেক ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যু হয়। এই জন্য ঐ দুইটি পরগণার শাসনকর্ত্তা রামচন্দ্র বল্লাল হুজুরে আবেদন করেন যে, চারি বৎসরের জন্য প্রজাদিগের সুবিধার জন্য খাজনা কমাইয়া দেওয়া হউক। পেশবা-সরকার তদনুসারে চারি বৎসরের জন্য খাজনা কমাইয়া দেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বন পরগণার অন্তর্গত পাচোরা গ্রামের অধিবাসিগণ পুণায় যাইয়া খাজনা রেহাইর প্রার্থনা করে; কারণ, সে বার তাহাদের গ্রামে ভাল ফসল হয় নাই। পেশবা-সরকার তাহাদের মোট দেয় রাজস্ব ২৬১৩৲র মধ্যে ১৩১৩৲ একেবারে রেহাই দেন এবং বাকী ১৩০০৲ চারি বৎসরে চারি কিস্তিতে আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জুন্নর প্রান্তের অন্তর্গত চাকণ তরফের অধীন আলন্দি গ্রাম শত্রু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। দুঃস্থ প্রজার আবেদনে জ্যেষ্ঠ মাধবরাও দুই বৎসরের খাজনা মাপ করেন। পেশবার কৌল-পত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে যে,

খাজনা মাপ করা হইল, কৃষির উন্নতির নিমিত্ত "আবাদানীবর নজর দেউন"—আবাদের দিকে নজর দিয়া।

পেশবাগণ দুঃস্থ প্রজার দুঃখ-অপনোদনে বিশেষ তৎপর ছিলেন ; সেই জন্য কেহ মনে করিবেন না যে, তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই প্রজাদিগের আবেদনের উপর যাহা হয় একটা হুকুম জারি করিয়া দিতেন। প্রমাণ স্বরূপ ১৭৬৪ সালের একখানি দলিলের অনুবাদ দিতেছি। তরফ খেড চাকণের হাবিলদার ভিকাজী বিশ্বনাথ এবং জুন্নর সরকারের দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে সরকারে নিবেদন করিয়াছে যে, জুন্নর প্রান্তের বহু গ্রাম মোগল কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত, উপদ্রুত ও দগ্ধ হইয়াছে। সুতরাং প্রজাদিগকে কিছু খাজনা রেহাই দেওয়া সুবেদারের উচিত। চাষের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু সুবেদারের দেখা নাই,—তিনি (তদন্তে) আসেন নাই। এই অবস্থায় হাবিলদার, দেশমুখ ও দেশপাণ্ডে দুঃস্থ প্রজাগণকে খাজনা রেহাইর কৌল দিবার অনুমতি চাহিতেছে। তদনুসারে নিম্নলিখিত আদেশ দেওয়া গেল,—

১। যে সকল গ্রামের শস্য, ও পশু অপহৃত হইয়াছে ও ঘরবাড়ী একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে, তথায় এক বৎসরের খাজনা মাপ করা হইবে।

২। আংশিকভাবে দগ্ধ ও লুণ্ঠিত গ্রামের অধিবাসীরা এক বৎসরের অর্দ্ধেক খাজনা রেহাই পাইবে।

৩। যে সকল গ্রাম কেবল লুণ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু দগ্ধ

হয় নাই,—সেখানে এক বৎসর খাজনার এক-তৃতীয়াংশ রেহাই দেওয়া হইবে।

৪। যে সকল গ্রাম টাকা দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, সেখানে এক বৎসর অর্দ্ধেক খাজনা মাপ করা হইবে।

৫। যে সকল গ্রামের কোন অনিষ্টই হয় নাই, সেখানে সম্পূর্ণ খাজনা আদায় করা হইবে।

৬। আগামী বৎসরের খাজনা প্রত্যেক গ্রামের অবস্থা দেখিয়া, গ্রামবাসীদিগের অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া ঠিক করা হইবে।

এই একটি কথায়ই মারাঠা-রাজস্ব-নীতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। খাজনা সর্ব্বদাই "জীবনমাফক" হইবে। অর্থাৎ খাজনার হার এমন হইবে যে, প্রজার দিতে একটুও কষ্ট না হয়, তার একটি পয়সা বেশীও নয়, কমও নয়। পেশবা-সরকারের বিচার-বিভাগের কথার আলোচনা কালে আমরা দেখিতে পাইব যে, কোন অপরাধীকে জরিমানা করিবার সময়ও এই সাধারণ নীতির অন্যথা করা হইত না।

এতক্ষণ আমরা সর্ব্বসাধারণের বিপদের কথার আলোচনা করিয়াছি। দুর্ভিক্ষে অগ্ন্যুৎপাতে গ্রাম, পরগণা, তরফের সর্ব্বসাধারণের কষ্ট হয়। আবার এমন সব বিপদও আছে, যাহাতে সাধারণের বিপদ না হইলেও, ব্যক্তিবিশেষের দুঃখ-কষ্টের সীমা থাকে না। ছোট-ছোট নগণ্য মানুষের দুঃখ-বিপদের প্রতিও পেশবাগণ একেবারে উদাসীন ছিলেন না। বিশেষতঃ, যখন এই সকল দুঃখ বিপদের কারণ হইত

তাঁহাদেরই উচ্ছৃঙ্খল সেনাদল। পেশবার ছাউনী বসিলে নিকটস্থ গ্রামের লোকের অসুবিধার সীমা থাকিত না। তাহাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইত, বাড়ীর গাছপালা, শাকসব্জী নষ্ট হইত, তাহাদিগকে বেগার খাটিতে হইত; অসুবিধার সীমা থাকিত না। কিন্তু এই অসুবিধার কথা পেশবার গোচর করিলেই ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইত। ১৭৬৮ সালে পেশবা মাধবরাও গরপীর নামক স্থানে এক চষা ক্ষেতে ছাউনী করিয়াছিলেন বলিয়া ১৬২৲ ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়াছিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মাধবরাও সফরে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে লোক-জন ও চাকর ছিল বিস্তর; সুতরাং পথের দুই ধারের সাধারণ লোকের ক্ষতিও হইয়াছিল অপরিমিত। পুণা পরগণার সুবেদার আনন্দরাও ত্রিম্বক তদন্ত করিয়া, এই ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্দেশ করার পর, উপদ্রুত প্রজাগণ সরকার হইতে ৮০০৲ ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ক্ষতির অনুপাতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনেক সময়েই খুবই অল্প হইত।

৮

জল-সেচনের বন্দোবস্ত

প্রজার দুঃসময়ে খাজনা রেহাই এবং সরকারী ফৌজের কুচকাওয়াজ ও ছাউনীর নিমিত্ত শস্যহানির ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিয়াই কিন্তু পেশবা-সরকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কৃষি-প্রধান দেশে কৃষিক্ষেত্রে সেচনের নিমিত্ত নিয়মিত জল-সরবরাহের বন্দোবস্তের প্রয়োজন। সর্ব্বদা মেঘের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইলে, শস্যের আশা ছাড়িয়া দিতে হয়, কারণ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অপ্রচুর বর্ষণ বা অকাল-বর্ষণ এই কলিযুগেরই বিশেষত্ব নহে। প্রাচীনকালেও প্রকৃতির এই অনিয়ম ও খামখেয়ালির জন্য ভারতবর্ষের লোক বিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু সেই জাতীয় উন্নতির দিনে তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিপর্য্যয়ের সংশোধনের ভার দেবতার হাতে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তখনকার হিন্দু-নরপতিগণ দেশের ও দশের কল্যাণার্থ সলিল-সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিতে যত্নপরায়ণ ছিলেন। তাহার বহু প্রমাণ চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে ও কল্হন-প্রণীত রাজতরঙ্গিণীতে আছে। কাশ্মীরে একজন নরপতির উদ্যোগে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃত্রিম উপায়ে জল-সেচনের এমন সুব্যবস্থা হইয়াছিল যে, এক বৎসরের মধ্যে শস্যের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল। মৌর্য্য-যুগে ও তাহার পরেও ভারতীয় নৃপতিরা কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া জল-সেচনের ব্যবস্থা করিতেন। তাহার প্রমাণ শক-

ক্ষত্রপ রুদ্রদমনের উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায়। পেশবারাও ভারতবর্ষের এই চির-পুরাতন নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রের কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের দুই প্রকার ব্যবস্থা ছিল। (১) পয়ঃ-প্রণালীর দ্বারা; এই ব্যবস্থা হইতেই 'পাটস্থল' নামের উৎপত্তি। (২) কূপ হইতে কপিকল ও বলদের সাহায্যে জল তুলিয়া যে সকল জমিতে দ্বিতীয় উপায়ে জল-সেচন করা হইত, তাহার নাম ছিল 'মোটস্থল'। সাধারণতঃ পর্ব্বতের উচ্চ-প্রদেশস্থ কোন খাদে বাঁধ দিয়া বর্ষার জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হইত। সেই জল পয়ঃ-প্রণালীর পথে বাহিত হইয়া কৃষিক্ষেত্রে নীত ও ব্যবহৃত হইত। এই প্রকার বাঁধ-নির্ম্মাণের ব্যয় কখনও বা সম্পূর্ণ, কখনও বা আংশিকভাবে, সরকারী তহবিল হইতে দিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রমাণ-স্বরূপ দুইখানি দলিল উদ্ধৃত করিতেছি।

বারোয়ার তালুকের অন্তর্গত কোপল পরগণার কামাবিসদার গোবিন্দরাও যাদবকে পেশবা-সরকার একখানি পত্রে লিখিয়া-ছিলেন—'এই পরগণার ধান্য-ক্ষেত্রে তুঙ্গভদ্রা হইতে বাঁধ ও খালের সাহায্যে জল আনীত হইত এবং ধান্য উৎপন্ন হইত। বৃষ্টিতে ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মেরামতের জন্য দুই হাজার হোন সম্প্রতি মঞ্জুর করা হইয়াছে। বাঁধটি ভাল করিয়া মেরামত করাইবে। খরচের টাকা তোমার পরগণার দেয় রাজস্ব হইতে কাটা যাইবে।' দ্বিতীয় পত্রখানি পেশবা-সরকার তরফ ঘোড়বারের অন্তর্গত নরসাপুর গ্রামের মোকদমকে লিখিয়াছিলেন। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম—'৮০০৲ টাকা ব্যয়ে

নরসাপুর গ্রামে শ্রীবাণেশ্বরের সান্নিধ্যে একটি বাঁধ বাঁধিবার আদেশ লক্ষ্মণকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে। ঐ ৮০০৲ টাকার মধ্যে ৪০০৲ টাকা সরকার হইতে দেওয়া হইবে। বাকী অর্দ্ধেক যে সকল কৃষক জমিতে জল নিবে, তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।' এই ভাবে কখনও রাজার এবং কখনও রাজা ও প্রজা উভয়ের ব্যয়ে কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের বন্দোবস্ত হইত। পেশবা-যুগে এই জন্যই মারাঠা-দেশে কৃষির এমন উৎকর্ষ হইয়াছিল যে, ওয়েলিংটন ও মনরোর ন্যায় ইংরেজ সেনানীরাও তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

৯

তগাই

প্রকৃতির অনিয়ম যেমন আধুনিক কালের আমদানী নহে, সেইরূপ মহাজনের অত্যাচারও এদেশে নূতন নহে। প্রাচীনকাল হইতেই কুসীদজীবীদিগের অত্যাচারে দরিদ্র কৃষককে বিপন্ন হইতে হইয়াছে। তখনও এসিয়া বা য়ুরোপে সমবায়-ঋণদান-সমিতি বা Co-operative Credit Societyর সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাহাদের কর্ত্তব্যের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন বলিয়া, রাজা তাঁহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই। উত্তমর্ণের কঠিন পীড়ন হইতে দরিদ্র কৃষককে রক্ষা করিবার এবং কৃষির উন্নতি-বিধানের অভিপ্রায়ে হল, গরু ও বীজ ক্রয়ের জন্য অভাবের সময় সরকারই

কৃষিজীবীদিগকে অল্প সুদে বা বিনা সুদে টাকা ধার দিতেন। কৃষকেরা নিজেদের সুবিধামত কখনও বা দুই বৎসরে, কখনও বা চারি বৎসরে, কিস্তিতে কিস্তিতে অল্প অল্প করিয়া সরকারী ঋণ শোধ দিত। এই ঋণের নাম তগাই ঋণ। তকাবী দিবার প্রথা আজও বর্ত্তমান; কিন্তু যেখানে পেশবা-সরকারের নিকট হইতে মারাঠী-কৃষকের প্রতিবৎসরই 'তগাই' মিলিত, সেখানে নিতান্ত দুর্বৎসর ব্যতীত ইংরেজ-সরকারের নিকট হইতে 'তকাবী' মিলে নাই। তখনও অর্থ-বিজ্ঞানের বিবিধ সূত্র রচিত হয় নাই, Laissez Faire বা উদাসীন-নীতি তখনও এদেশে অজ্ঞাত। রাজা মনে করিতেন, তিনি প্রজাগণের পিতৃ-স্থানীয়, তাহাদের ভালমন্দে দৃষ্টি না দিলে,—জোর করিয়াও বিনাশের পথ হইতে তাহাদিগকে টানিয়া না ফিরাইলে, পরকালে তাঁহাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে। তাই তিনি বাজার-দরও ঠিক করিয়া দিতেন, সুদের হারও বাঁধিয়া দিতেন, পাগ্‌ড়ীর কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন; আবার আবশ্যক হইলে উত্তমর্ণকে অধমর্ণের সহিত ন্যায়সঙ্গত-ভাবে রফা করিতে জোর করিয়া বাধ্য করিতেন। অন্যত্র বলিয়াছি শিবনের পরগণার পাটীল ও জমিদারগণ অন্যপ্রকারে আপনাদের অভাব-অভিযোগের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়া, ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া আলে গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটি অভিযোগ এই যে—প্রজাগণ ঋণদায়ে প্রপীড়িত; উত্তমর্ণদিগের দাবী কতদূর সঙ্গত, তৎসম্বন্ধে তদন্ত করা হউক। পেশবা-সরকার তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

"তোমরা নিবেদন করিয়াছ যে, বিভিন্ন গ্রামে রায়তেরা সাউকারের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। যদি হিসাব পরীক্ষার পর তাহাদের সঙ্গত দাবীর পরিমাণ স্থির হয়, এবং যদি তাহা পরিশোধ করিবার মত নগদ টাকা তোমাদের না থাকে, তবে ঋণের টাকা শস্য দ্বারা পরিশোধ করিবে। তাহাদের দাবী সম্বন্ধে যথাযোগ্য তদন্ত করা হইবে ; এবং সুদের হার অত্যধিক বিবেচিত হইলে, সরকার হইতে ন্যায্য হার ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে। তার পর তোমরা তোমাদিগের ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে কিস্তিতে কিস্তিতে পরিশোধ করিবে।"

কিন্তু কেবল আইনের বলে কুসীদজীবীর অত্যাচার নিবারণ করা যায় না। টাকার অভাব হইলে, এবং অন্যত্র কম সুদে ঋণ না পাইলে, কৃষককে অর্থ-গৃধ্নু মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হইবেই ; এবং উচ্চ হারে সুদ দিতেও নিজের প্রয়োজনের অনুরোধেই সম্মত হইতে হইবে। পেশবা-সরকার এই জন্যই তগাই ঋণ-দানের ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, এই নীতি-উদ্ভাবনের গৌরবের দাবী তাঁহারা করিতে পারেন না। কারণ, মারাঠা-সাম্রাজ্য স্থাপনের বহু পূর্ব্বেও মুঘল-সাম্রাজ্যে তকাবী ঋণের ব্যবস্থা ছিল।

তগাই সরকারী ঋণই বটে, কিন্তু টাকাটা সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইত না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা,—মাম্‌লত্‌দারই হউন, কামাবিস্‌দারই হউন,—নিজের তহবিল হইতে দুঃস্থ প্রজাদিগকে তগাই দিতেন। সুদের জন্য কোনই জুলুম করা হইত না। কখন কখনও বিনা সুদেই তগাই মিলিত। কিস্তি-

বন্দীর ব্যবস্থা সকল সময়েই থাকিত। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি দলিলে রাঘো গোবিন্দ নামক কর্ম্মচারীকে পরগণা পাটোদের অন্তঃপাতী মুখড়ে গ্রামের লোকদিগকে ১৫০০৲ তগাই দিতে বলা হইয়াছে। এই ঋণ তুই বৎসরে পরিশোধ করিবার কথা। প্রজারা অবশ্য তাহাদের সুবিধামত টাকাটা পরিশোধ করিবে। এই দলিলখানিতে সুদের আদৌ উল্লেখ নাই। অপর একখানি দলিলে কিন্তু সুদের উল্লেখ আছে। তখন মহাজনেরা লইতেন শতকরা ৭৫৲; আর তগাইর সুদ ছিল তাহার এক-তৃতীয় অংশ অর্থাৎ শতকরা ২৫৲ মাত্র। আর একখানি পত্রে পেশবা-সরকার লক্ষ্মণ হরি নামক কর্ম্মচারীকে তগাই পরিশোধের জন্য কসবা গোবলের খাতকদিগকে তাগাদা দিতে নিষেধ করিতেছেন; কারণ, সে বৎসর (১৭৭৩ খৃঃ) ঐ গ্রামে শস্য ভাল হয় নাই। তগাই ঋণ কেবল টাকায় দেওয়া হইত না;—প্রয়োজন হইলে প্রজাগণ শস্যও ধার পাইত। আর এই ঋণ আদায় হইবার পূর্ব্বেই যদি মাম্‌লত্‌দার বা কামাবিস্‌দারের চাকরী যাইত, তাহা হইলেও তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না; কারণ, সরকারী নিয়ম অনুসারে নূতন শাসনকর্ত্তাকে নিজের তহবিল হইতে মায় সুদ তগাইর টাকা ও শস্য পরিশোধ করিতে হইত। তার পর তিনি কিস্তিবন্দী করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেন। পেশবা-সরকার চিন্তামণ হরি নামক একজন কর্ম্মচারীকে একখানি পত্রে এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন—'ঐ পরগণার রায়তদিগকে তগাই দিয়া চাষ-আবাদ করিতে উৎসাহ দাও। যদি তোমার

চাকরী সম্বন্ধে কোন গোলমাল হয়, তবে নূতন মাম্‌লত্‌দার মায় সুদ তোমার টাকা পরিশোধ করিবেন।'

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, পেশবা-সরকার কৃষির উৎকর্ষ ও বিস্তারের জন্য আজকালকার সভ্যজগতের অনুমোদিত কোন উপায় অবলম্বনেই শৈথিল্য বা অবহেলা করেন নাই। কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্য পয়ঃপ্রণালী-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার তাঁহারা বহন করিতেন; পতিত, অনাবাদী জমির চাষ-আবাদের জন্য তাঁহারা উদ্যোগী প্রজাকে নিষ্কর ও অল্প-করে জমি দান করিতেন; মহাজনের উৎপীড়ন হইতে দরিদ্র রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অল্প সুদে এবং কিস্তিতে-কিস্তিতে অল্পে-অল্পে পরিশোধ করিবার চুক্তিতে তগাই ঋণ দিতেন; এবং জমির প্রতি যাহাতে চাষীর মমতা হয়, যাহাতে তাহারা সর্ব্বপ্রকারে চাষের জমির উৎকর্ষ-সাধনে উদ্যোগী হয়, এই জন্য তাঁহারা দীর্ঘকালের জন্য জমির কৌল দিতেন এবং চাষের জমির বিক্রয় ও বন্ধক রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরলোকগত বিচারপতি রাণাডে বলেন—"The system of revenue management under Balaji Baji Rao, Madhao Rao and Nana Fadnavis was, on the whole, careful. New sources of revenue were developed, and the old improved. The land settlements made by the Peshwas during this period show that, while anxious not to oppress the ryots, every care was taken to insist on the

rights of the Government. Whenever the country needed that relief, leases varying from three to seven years were granted on terms of Istawas, *i. e.*, gradually increasing assessment." পেশবা-যুগের রাজস্ব-নীতির সুফল বর্ণনা করিতে যাইয়া মার্শাল সাহেব লিখিয়াছেন,—(Marshall's Statistical Report of Belgaum, 1820)······encouraged husbandry by starting ploughing matches, and by showing marked consideration to exceptionally hard-working husbandmen. In this way every available inch came under tillage, and the country was filled with people, many very rich, and all happy and contented. The revenue in each village was fixed and moderate, settled without trouble and paid without a groan." অর্থাৎ কৃষি-কর্ম্মে উৎসাহিত করিবার জন্য চাষের প্রতিযোগিতার পুরস্কারের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল ; এবং বিশেষ পরিশ্রমী চাষীদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখান হইত। এইরূপে চাষের উপযোগী প্রত্যেক ইঞ্চি জমিই আবাদ হইয়াছিল, এবং দেশ জনপূর্ণ হইয়াছিল। অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকের ধন এবং সকলেরই সুখ-সন্তোষ ও তৃপ্তি ছিল। প্রত্যেক গ্রামের খাজনার হার অল্প ও নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই হার বিনা গোলমালে নির্দ্ধারিত হইত এবং প্রজারা বিনা কষ্টে খাজনা দিতে

পারিত। কোন দেশের রাজস্ব-নীতি সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা উচ্চতর প্রশংসা আর কি হইতে পারে? পুণার প্রথম ইংরেজ কলেক্টর কাপ্তেন রবার্টসন্ লিখিয়াছেন যে, নানার প্রভুত্ব সময়ে বাছিয়া-বাছিয়া উচ্চবংশের সচ্চরিত্র যুবকদিগকেই মাম্‌লত্‌দার ও সুবেদার নিযুক্ত করা হইত। বিশ্বস্ত লোককে খাজনার টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কড়ার না করিয়াই এই সকল চাকরী দেওয়া হইত। নানার সুশাসনে দেশে অন্যায় অত্যাচার অনেক কমিয়া গিয়াছিল। উচ্চবংশীয় যোগ্য ব্যক্তিদিগের হাতে বিভিন্ন জিলার ভার ছিল। প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে দেশব্যাপী কোন বিপদ হইলে তজ্জনিত ক্ষতি ও ছোট-খাট অনেক লোকসান সরকার গছিয়া লইতেন,—সাধারণ লোকের কোন অনিষ্ট হইত না। এই জন্যই, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষের পরও, দেশের অধিকাংশ জমিই অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত পুরাতন মালিকদের হাতেই ছিল। Between 1772 and 1800, the years of the administration of Nana Fadnavis, the management of the Peshwa's Land Revenue was perhaps more efficient than at any other time. The Mamlatdars or Subedars were chosen from families of character and respectability. The office was given to trustworthy persons without any special agreement as to the amount of revenue their charges

would supply. Under Nana's management abuses were restrained within narrow limits. Under the system above described, as a rule, with men of ability and position in charge of the same districts for long times of years and with the provision that the weight of all general calamities and of most minor losses should fall on the government and not on the people, inspite of the terrible period of distress caused by the famine of 1792, the bulk of the landholders remained on their hereditary estates till the close of the 18th century. ইংরেজ-বিজয়ের পর সুবিখ্যাত এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ সাহেব মহারাষ্ট্রে পুরাতন রাজস্ব-নীতিই অব্যাহত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম-প্রথম এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মত সহৃদয় শাসনকর্ত্তাও যে দেশের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও প্রজার মনের সন্তোষ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই, তাহার বহু প্রমাণ Bombay in the Days of George IV নামক গ্রন্থে বোম্বাইয়ের তদানীন্তন প্রবীণ বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড ওয়েষ্টের পত্নী লেডি ওয়েষ্টের দৈনন্দিনী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রবার্টসন বলিয়াছেন যে, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও দেশের ভূম্যধিকারিগণ তাঁহাদের পৈতৃক ভূমি হারান নাই; আর শ্রীমতী ওয়েষ্টের দৈনন্দিনীর সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন যে, যখন এল্‌ফিন্-

ষ্টোন্ মারাঠা-শাসনের নিন্দা ও কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতির বহু প্রশংসা করিয়া, তাঁহার সুবিখ্যাত রিপোর্ট লিখিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই মহারাষ্ট্রের প্রজাগণ অনশনে কাতর ও অবিচারে উত্ত্যক্ত হইয়া, দলে-দলে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া, নিকটস্থ দেশীয় রাজ্যগুলিতে চলিয়া যাইতেছিল। মারাঠা শাসন-পদ্ধতি যে কোম্পানী-শাসন-পদ্ধতির তুলনায় অপকৃষ্ট ছিল না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পেশবা-যুগের রাজস্ব-নীতি সেকালের পাশ্চাত্য দেশসমূহের রাজস্ব-পদ্ধতির তুলনায়ও অপকৃষ্ট ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা-কৃষকের অবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দীর আইরিশ প্রজাদিগের তুলনায় অনেক ভাল ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও আইরিশ প্রজাগণ যে সকল অধিকারের জন্য আন্দোলন করিতেছিল, সেই ন্যায্য খাজনার হার, দীর্ঘকালের জন্য জমির চাষের স্বত্ব, প্রভৃতি অধিকার মারাঠা-প্রজাদিগের বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল। পেশবা জ্যেষ্ঠ মাধবরাও তাঁহার রাজ্যে 'বেঠ বেগার' রহিত করিয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও মধ্য প্রদেশে বেগার প্রথা প্রচলিত ছিল। ফরাসী দেশের প্রজাগণকেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত জমিদারের জন্য ও সরকারের জন্য বেগার খাটিতে হইত। সে দেশে বেগার-প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে তখন, যখন বিপ্লবের বিরাট রক্ত-প্রবাহে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, জমিদার ও কৃষকের সকল বৈষম্য ভাসিয়া গিয়া, ফরাসী দেশের প্রাচীন সমাজ, প্রাচীন শাসন-তন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর নবীন সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে

একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। মারাঠা-প্রজার যতই অধিকার থাকুক না কেন, সে তাহা রাজার নিকট হইতে বাহুবলে কাড়িয়া লয় নাই। তাহার সমস্ত অধিকারই রাজার দয়াদত্ত দান, আর ইংরাজ ও ফরাসী প্রজার সকল অধিকার তাহাদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জ্জিত, বাহুবললব্ধ। এক রাজা যাহা স্বেচ্ছায় দান করিয়াছিলেন, অপর রাজা তাহা আবার প্রত্যাহার করিতে পারেন। মহারাষ্ট্রের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। শিবাজী হইতে নানা ফড্‌নবিস্ পর্য্যন্ত এতগুলি মহামনীষী দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য যে শাসন-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের তর্জ্জনী-হেলনে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইল; প্রজার কোন আবেদনে তিনি কর্ণপাত করিলেন না। রঘুনাথের দৌর্ব্বল্য ও আনন্দীবাইয়ের কুটিলতার উত্তরাধিকারী অর্থগৃধ্নু দ্বিতীয় বাজীরাও সাহেব আবার দেশের খাজনা ইজারা দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। শিবাজী যে কুপ্রথা রহিত করিয়াছিলেন, বাজীরাও তাহা পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করিলেন। ফলে, দুষ্ট লোকেরা ইজারা ঠিক হইবার সময়ে, অনেক বেশী টাকা হাঁকিয়া মাম্‌লত্‌দার ও সুবেদারের পদ কিনিয়া লইতে লাগিল। প্রজার শক্তি নাই যে, সে অত টাকা দেয়। তাই প্রতি বৎসর নূতন-নূতন মাম্‌লত্‌দার খাজনার ইজারা লইয়া তালুক ও পরগণার মালিক হইয়া আসিতে লাগিলেন। যাঁহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-আরম্ভ-কালের বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফলের কথা

বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। নূতন ইজারাদারের সহিত পরগণার প্রজার এক বছরের মাত্র সম্পর্ক; সুতরাং সে তাহাদিগকে দয়া করিবে কেন? এই এক বৎসরের মধ্যে সে তাহার তহবিল যতটা পূর্ণ করিয়া লইতে পারে, ততই তাহার লাভ। আগে খাজনার হার বেশী হইলে, পাটীল ও কুলকর্ণীর প্রতিবাদে তাহার প্রতিবিধান হইত। নূতন ইজারাদারেরা পাটীলের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। পাটীল তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইলে, ইজারাদারেরা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াই খাজনা আদায়ের উপলক্ষে প্রজার ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের প্রতাপে মহারাষ্ট্রের অমন পল্লী-সমাজও পঙ্গু হইয়া পড়িল। কোন পদ্ধতিই, সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রবল লোকমত পশ্চাতে না থাকিলে, রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে টিকিতে পারে না। তাই পেশবা-কুল-কলঙ্ক, কাপুরুষ বাজীরাও অনায়াসে মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রাচীন শাসনপদ্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিয়াছিল। দেড় শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত বহু মনীষীর একাগ্র সাধনায় যে শাসন-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, একজন মাত্র কুশাসকের চেষ্টায় তাহা ধ্বংস হইয়া গেল। আর ঐ সময়েই ফরাসী দেশে প্রবল প্রজামতের ভৈরব হুঙ্কারে বহুদিনের জরাজীর্ণ স্বেচ্ছাতন্ত্রের শক্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময়েই সমবেত জনমণ্ডলীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে রাজ-কারাগার বাস্তিলের লৌহ-কবাট মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার স্বর্ণদেউলের অবরুদ্ধ দ্বারও পশ্চিমের জনগণের সম্মুখে উন্মুক্ত

হইল। সে দেশে সেই দেউলের পূজা-আরতি এখনও মহোৎসবে চলিতেছে।

১০

বাট্টাই

মহারাষ্ট্রে খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট হইত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে, এ কথা আগে অনেক বার বলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া ভাল জমি হইতে পেশবা-সরকার শস্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতেন না। পাহনীদারেরা দেখিয়া-শুনিয়া একটা নিরিখ বাঁধিয়া দিতেন; প্রজারা সেই নিরিখ অনুসারে খাজনা দিত। অজন্মা হইলে প্রজা খাজনা রেহাই পাইত। খারাপ জমির বেলায় কিন্তু প্রজারা রাজার সহিত একটা হারাহারি ভাগের বন্দোবস্ত করিতেই চাহিত,—রাজাও এই বাট্টাই বন্দোবস্তে আপত্তি করিতেন না। রাণাডের ভাষায় বাট্টাই বিভাগের পরিচয় দিতেছি। "Wherever the Battai or system of crop division obtained, the Government after deducting for seeds and other necessary charges paid by the ryots left $\frac{1}{2}$ or $\frac{1}{3}$ of the crop to the cultivator, and took the rest for the State······The Battai system was not much in favour." এক কথায়, চাষের ব্যয় বাদ দিয়া বাকী শস্যের অর্দ্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ প্রজা পাইত, বাকী অংশ সরকারে যাইত। মনে রাখিতে হইবে যে, বাট্টাই প্রথার প্রচলন খুব

অল্প জায়গায়ই ছিল; এবং এই প্রথা ক্রমে-ক্রমে লোপ পাইতেছিল।

১১

বাজে জমা

ভূমিকর ব্যতীত মারাঠা-প্রজাদিগকে আরও অনেক কর দিতে হইত। এই সকল অতিরিক্ত করের কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু-যুগ হইতে, এবং কতকগুলি মুসলমান-শাসনের সময় হইতে প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক কর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হইবে না, তাই নিম্নে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ সাহেবের রিপোর্ট হইতে পেশবা-যুগে প্রচলিত আবওয়াব বা বাজে জমার একটি তালিকা উদ্ধৃত করা গেল। এতৎপ্রসঙ্গে এইটুকু মনে রাখা আবশ্যক যে, এই করগুলি একই জায়গায় অথবা একই সময়ে আদায় করা হইত না। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের অধিবাসিগণকে বিভিন্ন রকমের বাজে জমা দিতে হইত,—সেই সমস্ত একত্র করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

১। দহক পট্টি—প্রতি দশ বৎসরে এক বৎসরের খাজনা। এই কর দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের জমির উপর ধার্য্য হইত।

২। হক চৌথাই—প্রতি বৎসরের খাজনার চতুর্থাংশ।

৩। মহার মহলী—মহারদিগের ইনাম জমির উপর কর।

৪। মিরাস পট্টি—তিন বৎসর অন্তর দেয়, মিরাসদারদিগের উপর এই কর ধার্য্য হইত।

৫। ইনাম তিজাই—ইনামদারেরা ইনাম জমির সরকারী

অংশের এক-তৃতীয়াংশ সরকারে দিতেন,—এই করের নাম ইনাম তিজাই।

৬। ইনাম পট্টি—কখন-কখনও সরকারের অতিশয় অভাবের সময় ইনামদারদিগের নিকট হইতে এই কর আদায় করা হইত।

৭। পাণ্ডি গল্লা—১২ বৎসরে একবার শতকরা ১২৲ অতিরিক্ত করা হইত।

৮। বিহির হুণ্ডা—কূপের জলে যে সকল জমির চাষ হয়, তাহার উপর অতিরিক্ত কর।

৯। ঘর পট্টি—ব্রাহ্মণ ও পল্লী-সমাজের কর্ম্মচারী ব্যতীত গৃহস্থের দেয়।

১০। বট ছাপাই—পেশবা-সরকার প্রত্যেক বৎসর বাটখারা প্রভৃতি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করিতেন; এবং এইজন্য দোকানীদিগকে বট ছাপাই নামক কর দিতে হইত।

১১। তাগ—পাল্লা ঠিক আছে কি না দেখিবার জন্য কর।

১২। লগন টক্কা—বিবাহ কর।

১৩। পাট দাম—বিধবা বিবাহের কর।

১৪। মৈস পট্টি—প্রত্যেক গোয়ালার নিকট হইতে দুগ্ধবতী মহিষী প্রতি ১৲ হিসাবে কর আদায় করা হইত।

১৫। বকরা পট্টি—মেষ ও ছাগের কর।

১৬। ফরমাস—কখন-কখনও বেগারের পরিবর্ত্তে শিল্পীদিগের নিকট হইতে তাহাদের কারখানায় উৎপন্ন পণ্য গ্রহণ করা হইত,—তাহার নাম ফরমাস।

১৭। বন চরাই—সরকারী ময়দানে বা জঙ্গলে পশু চরাইবার জন্য দেয় কর।

১৮। ঘাস কাটানি—সরকারী জমির ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতির মূল্য।

১৯। দেবস্থান দাবী—দেব-মন্দির হইতে প্রাপ্ত আয়।

২০। খরবুজওয়ারী—নদী-তীরের তরমুজের ক্ষেতের কর।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত রূপেও সরকারী তহবিলের অভাব কখন-কখনও পূরণ করা হইত—

১। বেতুল মহল—উত্তরাধিকারিহীন সম্পত্তির আয়। এই সকল সম্পত্তি স্বভাবতঃই সরকারী সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

২। বতন জপ্তি—জমিদার বা অপর কোন বতনদারের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইলে, বা ঐ সকল সম্পত্তির উপর সরকারী ক্রোক দেওয়া হইলে, তাহার আয়ও সরকারী তহবিল-ভুক্ত হইত।

৩। নজর বা উত্তরাধিকারের কর (Succession duty)—জায়গীরদার বা সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর সকলকেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তির জন্যই একবার এই কর দিতে হইত।

৪। কোতোয়ালী—বাজে জমা প্রায় সবই কোতোয়ালীর অন্তর্গত; অতএব ইহাকে একটি কর না বলিয়া কর-সমষ্টি বলাই উচিত। কোতোয়ালীর অন্তর্গত করগুলির মধ্যে

ঘর বিক্রয়ের করটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। বিক্রীত গৃহের মূল্যের ষষ্ঠাংশের কিঞ্চিদধিক পেশবা-সরকার পাইতেন।

গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে এই সকল বাজে জমা বা অতিরিক্ত কর পাটীলই আদায় করিতেন; তাঁহার সঙ্গে ইহার জন্য একজন অতিরিক্ত সরকারী কর্ম্মচারী থাকিত। কখন-কখনও বাজে জমাগুলি ইজারাও দেওয়া হইত; কারণ, সরকারী অভাব। সাধারণ উপায়ে এই অভাব মোচন না হইলে, আবার পেশবা-সরকার কখন-কখনও জাস্তি পট্টি বা অতিরিক্ত কর হিসাবে প্রজার নিকট হইতে আরও কিছু টাকা আদায় করিতেন। কখন-কখনও তাঁহারা কর্জ্জপট্টি চাহিতেন। এই কর্জ্জপট্টি নামেই ঋণ; প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ডের benevolence বা forced loanএর মত এই টাকাকে জবরদস্তীর দান বলিলেই চলে।

বাজে জমার এত বড় একটা লম্বা ফর্দ্দ দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে, মারাঠা প্রজাগণের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। বাস্তবিক কিন্তু পেশবা-সরকারের রাজস্ব-নীতির মূল সূত্রের কখনও ব্যত্যয় হইত না। তাঁহারা জানিতেন, প্রজার নিকট হইতে তাহাদের সাধ্যাতিরিক্ত কর দাবী করা হইবে না,—সাধারণ করও নহে, বাজে জমাও নহে। তাই বাজে জমা আদায়ের সময়েও প্রজার সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা হইত। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পেশবা-সরকার হইতে সাতারার কৃষ্ণরাও অনন্তের নিকট একখানি চিঠি লেখা হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ "মোরো গণেশ বেহেরের নিবাস সাতারায়।

হুজুর অবগত হইয়াছেন যে, তুমি তাহাকে ও তাহার পরিবার-বর্গকে ঘরপট্টির জন্য ভয়ানক তাগাদা দিতেছ। দুই বৎসর হইল মোরগিরির নিকটে এই ব্যক্তি ডাকাতের হাতে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। তাহার পর তাহার ভ্রাতাও দস্যুহস্তে হত হইয়াছে। সুতরাং বেহেরে এখন বড়ই দুরবস্থায় পড়িয়াছে। আমরা তাহার প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া তাহার ঘরপট্টি মাপ করিলাম। এইজন্য অতঃপর তুমি তাহার পরিবারবর্গকে তাগাদা করিও না।” সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ঘরপট্টি মোটেই দিতে হইত না ; এবং কোঙ্কণের ব্রাহ্মণ ও প্রভুদিগের নিকটেও এই কর আদায় করা হইত না। সাধারণতঃ পেশবাযুগে মিরাস জমি ১০ গুণ বহায়ে বিক্রয় হইত। জমির এই উচ্চমূল্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বাজে জমা দিয়াও প্রজার বেশ লাভ থাকিত।

কোন কোন বাজে জমা আবার সাধারণ প্রজার হিতার্থেই কল্পিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বনচরাইর নাম করা যায়। বনচরাই খুব পুরাতন কর। মুসলমান শাসনকালেও ইহার প্রচলন ছিল। তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, আইন-ই-আকবরী ও খাফি খাঁর গ্রন্থে এই করের উল্লেখ আছে। ফিরোজশাহ ও ঔরংজীব এই কর রদ করিয়াছিলেন। পেশবাগণ কিন্তু এই কর সাধারণ প্রজার অসুবিধা নিবারণের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। মহারাষ্ট্রে একদল পেশাদার মেষপালক বা খিলারী ছিল। এই খিলারীদিগের পশুপাল অনেক সময়েই লোকের ক্ষেতে পড়িয়া শস্যহানি করিত। পেশবা-সরকার এই জন্য

খিলারীদিগকে পশু চরাইবার জন্য পরোয়ানা লইতে বাধ্য করিতেন। বলা বাহুল্য, এই পরোয়ানার জন্য খিলারীদিগকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে হইত; এবং তাহাদের পালের পশুসংখ্যাও সরকারী পরোয়ানায় স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকিত। পরোয়ানার অতিরিক্ত মেষ রাখিতে হইলে, সরকারে শতকরা ৬৲ হিসাবে কর দিতে হইত। সাধারণ রায়তের গরু, বাছুর, মেষ বা ছাগের জন্য বনচরাই দিতে হইত না। এই কর সত্ত্বেও খিলারীদিগের উপদ্রব এমন বাড়িতেছিল যে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে শিরওয়াল প্রান্তের সকল খিলারীর পশুই সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে সরকারী পরওয়ানার সহিত মিলাইয়া কতকগুলি পশু ফেরত দেওয়া হইয়াছিল বটে; কিন্তু পরোয়ানার অতিরিক্ত একটি মেষও খিলারীরা ফিরিয়া পায় নাই।

বাজে জমা আদায় উপলক্ষে পেশবা-সরকারকে রাজ্যের ঘরবাড়ী ও পশু-সংখ্যার সঠিক হিসাব রাখিতে হইত। কারণ, বিনা পরিদর্শনে কর গ্রহণের রীতি তখন ছিল না। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ঘোষালে পরগণার গৃহ ও মহিষের সংখ্যা নির্ণয় করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সরকার তাহাকে পূর্ব্ব বৎসরের ঘর ও জানোয়ারের সুমারীর কাগজ দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। পর বৎসর পালা, অষ্টমী, নাগোঠনে, ঘোষালে, চিরওয়ারি এবং তলে তরফের ঘর ও জানোয়ার সুমারীর জন্য অনেকগুলি কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছিল। এই প্রকারে বাজে জমার হার ও পরিমাণ নির্ণয় উপলক্ষে পেশবা সাম্রাজ্যের statistics সংগৃহীত হইয়াছিল।

১২

জঙ্গল বিভাগ

বন বিভাগ হইতেও পেশবা-সরকারের কিছু আয় হইত। তবে সে আয়ের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তি ঘোষালে পরগণার সমস্ত তালগাছের (অবশ্য সরকারী সম্পত্তি) ইজারা মাত্র ১৫৪॥৵০ জমায় লইয়াছিল। সরকারী জঙ্গলের কাঠ বেচিয়াও বেশী টাকা পাওয়া যাইত না—জ্বালানি কাঠ ত এক বলদের বোঝা।০ দিলেই কাটিয়া আনা যাইত। বনে জঙ্গলে মৌচাক হয়, চাকের মধু হইতেও সরকারী তহবিলে যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তি ছিল। কিন্তু এই সমস্ত মিলিয়াও এত অল্প আয় হইত যে, টাকা অপেক্ষা জঙ্গলের উৎপন্ন দ্রব্যের খাতিরেই পেশবা-সরকার জঙ্গল বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সামরিক প্রয়োজনের হিসাবে জঙ্গল মহলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাখা হইতেছে কুরণ—কুরণ ঘাসের জমি। সরকারী জমিতে ঘাস রাখা হইত অশ্বারোহী ফৌজের প্রয়োজনে। জিবাজী কৃষ্ণ নামক একজন কুরণের মাম্‌লত্‌দারের নিয়োগপত্রে নিম্নলিখিত কর্ত্তব্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছিল।

১। প্রতি বৎসর তাহাকে পুণায় সরকারী ব্যবহারের জন্য ১৫ লক্ষ আঁটি ঘাস দিতে হইবে এবং পুণার ৫-৬ ক্রোশের মধ্যে আরও ১৫ লক্ষ আঁটি মজুদ রাখিতে হইবে। পেশবার

কর্ম্মচারীদিগের পত্র দেখাইলেই ঐ ঘাস ঘোড়া বা উটের আস্তাবলে দিতে হইবে।

২। পুণার ১৫-২০ ক্রোশের মধ্যে সরকারী বেসরকারী সমস্ত কুরণের ভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র সরকারী কুরণ করিতে হইবে।

৩। পুণায় প্রতিবৎসর সরকারী ব্যবহারের জন্য ১৬০০ খণ্ডি জ্বালানি কাঠ ও ১৬০ খণ্ডি কয়লা দিতে হইবে।

৪। বেসরকারী কুরণ হইত যে সকল কাঠ, জ্বালানি কাঠ, ঘাস, বাঁশ, পাতা ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে মালিকের যাহা প্রয়োজন হয় তাহা তাহাকে দিবে। এবং সরকারী প্রয়োজনে যাহা লাগে তাহা রাখিয়া, বাকী জিনিস সমস্ত বিক্রয় করিবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী তহবিলে জমা দিবে।

৫। যে সকল ব্যবসায়ী বলদে করিয়া কাঠ লইয়া যায়, তাহাদের নিকট বোঝা প্রতি ।০, অথবা সম্ভব হইলে, বেশী আদায় করিবে। যে সকল রাখাল কুরণ জমিতে পশু চরায়, তাহাদের নিকট হইতে বনচরাই আদায় করিবে এবং আদায়ী টাকা সরকারে জমা দিবে। (মূল দলিলের জন্য পেশবাদিগের ডায়েরী ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৫৬ পৃঃ দেখুন।)

সরকারী কর্ম্মচারীরা ঘরবাড়ী করিবার জন্য প্রয়োজনমত জঙ্গলমহল হইতে বিনা পয়সায় কাঠ লইতে পারিত। আবার দুঃস্থ প্রজারাও যে এইরূপ সরকারী সাহায্য না পাইত তাহা নহে। তলবাড়নিবাসী মহারদিগের গৃহদাহ হইলে নূতন গৃহ

নির্ম্মাণের জন্য তাহারা চাকণ তরফের সরকারী জঙ্গল হইতে ৭৫০টি বাঁশ বিনামূল্যে পাইয়াছিল। জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক কাজের জন্যই সরকারী জঙ্গলমহলের উৎপন্ন দ্রব্য পেশবা-সরকারের অনুমতি লইয়া বিনামূল্যে আনা যাইত, আর সে অনুমতি চাহিয়া কেহ কখনও বিমুখ হয় নাই।

১৩

টাঁকশাল

সকল রাজারই টাঁকশাল হইতে অল্পাধিক আয় হয়,—পেশবাদিগেরও হইত। পেশবা-যুগে টাঁকশাল একেবারে খাঁটি সরকারী বিভাগ ছিল না,—টাঁকশালের কাজ, টাঁকশালের তত্ত্বাবধান করিত সাধারণ সোনারেরা। এই ব্যবস্থার মূলে মারাঠাদিগের তথা হিন্দুদিগের প্রাচীন নীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারপতি রাণাডে লিখিয়াছেন—The Hindu financier whose opinions were so prominently referred to in one of the articles on Indian affairs published in a recent issue of the London Times reflected the views of his countrymen faithfully enough, when he observed that "No Government has the right to close its mints or to say that the currency of the country was either deficient or redundant.

That was a question solely for the bankers, traders and merchants to consider. If they do not require money, they will not purchase bullion to be coined. The duty of Government is merely to assay all bullion brought to the mint for coinage and to return the value of bullion in money.” সম্প্রতি লণ্ডন টাইম্‌সে ভারতবর্ষের সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে যে হিন্দু অর্থনীতিবিদের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগের মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন সরকারেরই টাঁকশাল বন্ধ করিবার অথবা দেশে মুদ্রার সংখ্যা কম কি বেশী হইয়াছে তাহা বলিবার অধিকার নাই। সে প্রশ্নের বিচার কেবল পোদ্দার, সওদাগর ও বণিকেরাই করিতে পারেন। যদি তাঁহাদের টাকার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাঁহারা মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য ধাতু কিনিবেন না। সরকারের কর্ত্তব্য, টাঁকশালে যত ধাতু আসে, তাহার বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে টাকা দেওয়া। ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যে অন্ততঃ ছত্রিশ রকমের স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। তাঁহার শিবরাই পয়সা এখনও পাওয়া যায়। এক এবট সাহেবই ২৫০০০ শিবরাই পয়সা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজীর স্বর্ণমুদ্রা বা শিবরাই হোন এখন পর্য্যন্ত দুইটির বেশী পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তিনি ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন রাজার সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা যে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতেন, তাহা

অনায়াসেই অনুমান করা যায়। ইংরেজ দূত অক্সিনডেনকে তিনি নিজেই এই কথা বলিয়াছিলেন। অক্সিনডেন প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, বোম্বাইয়ের ইংরেজ কোম্পানীর মুদ্রা শিবাজীর রাজ্যে চালাইবার অনুমতি দেওয়া হউক, বোম্বাইতেও শিবাজীর মুদ্রা চলিবে। উত্তরে ছত্রপতি মহারাজ বলিয়াছিলেন,—তিনি তাঁহার রাজ্যে কোন প্রকারের মুদ্রার প্রচলনই নিষেধ করেন না; অপর পক্ষে তিনি তাঁহার প্রজাদিগকে (অপকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণ করিয়া) ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য করিতে পারেন না। যদি ইংরেজের মুদ্রা ওজনে ও বিশুদ্ধিতে মুঘল ও অন্যান্য রাজাদিগের মুদ্রার সমতুল্য হয়, তবে তিনি তাহার প্রচলন নিষেধ করিবেন না। He forbids not the passing of any manner of coins, nor on the other side can he force his subjects to be losers; but if our coin be as fine an alloy and as weighty as the Mugal's and other prince's he will not prohibit. (Fryer, A New Account of East India and Persia) এই অবাধ মুদ্রাপ্রচলন-নীতির ফলে অনেক বিদেশী মুদ্রাও শিবাজীর রাজকোষে স্থান পাইয়াছিল। রাণাডে বলেন, এই কারণেই মারাঠা সাম্রাজ্যে এত বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল যে, ইংরেজ বিজয়ের পর, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের সুবিধার জন্য একটি তালিকা তৈয়ারী করা হইয়াছিল; ঐ তালিকায় ৩৮ প্রকারের স্বর্ণমুদ্রা ও একশত সাতাশেরও অধিক রৌপ্যমুদ্রার নাম পাওয়া যায়। (In an

official table published for the guidance of the civil courts in the Bombay Presidency, the names of no less than thirty-eight gold coins and over one hundred and twenty-seven silver coins are mentioned as still so far current in different parts of this Presidency as to make it worth while to give the relative intrinsic values of these local currencies in exchange for the Queen's coin.)

পেশবা-সরকার নিজেদের হাতে টাঁকশালগুলি রাখিতেন না বলিয়া যে, লোকের মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অবাধ স্বাধীনতা ছিল, তাহা নহে। টাঁকশাল খুলিবার জন্য সরকারী সনদের দরকার হইত ; আর সনদ পাইতে হইলেই কিছু দক্ষিণা দিতে হইত। দক্ষিণার কোন নির্দ্দিষ্ট হার ছিল না। কিন্তু দক্ষিণার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, সনদ লইয়া কোন সোনারই রাজার নামের মুদ্রার উৎকর্ষের হানি করিতে পারিত না। ধাতুর পরিমাণ ও মুদ্রার ওজন তাহাকে ঠিক রাখিতেই হইত, নহিলে সাজা হইত। একখানি সনদ পড়িলেই এই প্রথা বেশ ভাল করিয়া বোঝা যাইবে। সনদখানির তারিখ ১৭৪৪ এবং বিচারপতি রাণাডের মতে এইখানিই এতৎসম্বন্ধীয় প্রাচীনতম দলিল।—"বালাজী বাপুজীকে ১০ মাসা ওজনের পয়সা তৈয়ারী করিবার জন্য নাগোঠনে গ্রামে একটি টাঁকশাল খুলিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে। ঐ ওজনের পয়সা তৈয়ারী

করিতে হইবে। পয়সার ওজন কম হইলে তাহার জরিমানা হইবে।" বালাজী বাপুজী কি দক্ষিণায় কত বৎসরের জন্য টাঁকশাল খুলিবার অধিকার ক্রয় করিয়াছিলেন, সে সংবাদও ঐ সনদেই পাওয়া যায়। প্রথম বৎসরে তাহাকে ১২৷৷০ টাকা হিসাবে চারি কিস্তিতে মোট ৫০৲ দিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে চারি কিস্তিতে ৭৫৲ ও তৃতীয় বৎসরে চারি কিস্তিতে ১০০৲ এই টাঁকশালের সনদের জন্য সরকারী তহবিলে গিয়াছিল। সুতরাং বালাজী বাপুজী মাত্র তিন বৎসরের জন্য পয়সা তৈয়ারীর অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রাণাডে বলেন যে, ছত্রপতি শাহু ও কোহ্লাপুরের ছত্রপতিদিগের সরকারী টাঁকশাল ছিল।

পেশবা-সরকার বিনা আপত্তিতে টাঁকশাল খুলিবার সনদ দিতেন বলিয়া, বেসনদী টাঁকশাল অথবা অপকৃষ্ট মুদ্রা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু টাকা জাল করিবার প্রবৃত্তি নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও সকল দেশেই প্রবল। পেশবা-সরকার আবার টাঁকশাল নিজেদের হাতে রাখেন নাই। টাকা তৈয়ারী করিবার যন্ত্রও তখন এখনকার মত উন্নতি লাভ করে নাই; গোলাকার ধাতুখণ্ড ছাঁচের উপর রাখিয়া হাতুড়ী দিয়া পিটাইয়া পেশবাযুগের মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত। কাজেই, অনেক লোকই নিজেদের বাড়ীতে টাঁকশাল খুলিয়া টাকা মোহর প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিল। ধারোয়ার প্রান্তে ত ঘরে ঘরে টাঁকশাল বসিয়া গেল। বেসনদী টাঁকশাল খোলা হইত লাভের জন্য; সুতরাং প্রচলিত মুদ্রার বিশুদ্ধি বা

নিয়মিত ওজনও অব্যাহত রহিল না। পাণিপথের যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্ব্বে পেশবা বালাজী বাজীরাও পাণ্ডুরঙ্গ মুরার নামক এক ব্যক্তিকে লিখিয়াছেন—ধারোয়ার প্রান্তে যে সকল টাঁকশাল আছে, তাহাতে অপকৃষ্ট হোন, মোহর ও টাকা প্রস্তুত হয়। পুরাতন টাঁকশালগুলিতে বিশুদ্ধ মুদ্রা প্রস্তুত হইত। সম্প্রতি জমিদারেরা ঘরে ঘরে টাঁকশাল খুলিয়া খারাপ টাকা চালাইতেছে। ইহার প্রতিকার স্বরূপ পেশবা পাণ্ডুরঙ্গকে আদেশ করিতেছেন যে, ধারোয়ারের সকল টাঁকশাল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি নিজের তত্ত্বাবধানে ধারোয়ারের কেন্দ্রস্থানে একটি টাঁকশাল খুলিবে ও টাকা প্রস্তুত করিবার মজুরী হাজারকরা ৭৲ হিসাবে লইবে। ঐ টাকার মধ্যে ৬৲ সরকারী তহবিলে যাইবে ও ১৲ তোমার পারিশ্রমিক। কিন্তু প্রথম-প্রথম পোদ্দারদিগকে এই সরকারী টাঁকশালে আকৃষ্ট করিবার জন্য এক বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে টাকা প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। ইহাতেও যখন অপকৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইল না, তখন পেশবা জ্যেষ্ঠ মাধবরাও সকল কামাবিস্‌দার, জমিদার ও মহাজনদিগের উপর হুকুম জারি করিলেন যে, অতঃপর সরকারী তহবিলে নূতন মুদ্রা ব্যতীত পুরাতন মুদ্রা গ্রহণ করা হইবে না। বেসরকারী টাঁকশালের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। এইটুকু মনে রাখিলেই চলিবে যে, পেশবা-সরকার টাঁকশালগুলির কেবল সাধারণ ভাবে

তত্ত্বাবধান করিতেন মাত্র; দেশের মুদ্রার সংখ্যা বাড়াইবার বা কমাইবার চেষ্টা তাঁহারা কখনও করেন নাই।

আজকাল আমরা কাগজের টাকার সহিত খুব পরিচিত। কাগজের টাকার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ইহা খুব হাল্‌কা, সুতরাং অনেক টাকাও বহিয়া লইয়া যাইতে কোন কষ্ট হয় না। পেশবা-যুগে এই জন্য হুণ্ডির খুব প্রচলন হইয়াছিল। দূরদেশ হইতে টাকা পাঠাইতে হইলে লোকে হুণ্ডিই পাঠাইত। সরকারী কর্ম্মচারীরাও সরকারী তহবিলের টাকা হুণ্ডি দ্বারাই চালান দিতেন, বেশী টাকার ত কথাই নাই,—অল্প টাকার নোটের মত, অল্প টাকার হুণ্ডিও তখন খুবই চলিত। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কাশিনাথ রাজবাড়ে সম্পাদিত মারাঠাদিগের ইতিহাসের উপাদানের ১০ম খণ্ডে গণেশভট নামক এক ব্যক্তির একখানি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে ১৩৷৹ টাকার হুণ্ডির উল্লেখ আছে।

১৪

শুল্ক

পেশবা-সাম্রাজ্যে প্রচলিত শুল্কগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। (১) মোহতর্ফা অথবা ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে গৃহীত ব্যবসায়-কর। (২) জকাত অথবা ক্রয়-বিক্রয়-আমদানী-রপ্তানী-কর। চারিখানি দলিল হইতে মোহতর্ফার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা যায়: (ক) ১৭৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে

লিখিত রেওদণ্ডার কামাবিস্‌দারের নিকট লিখিত পত্র; (খ) ঐ বৎসরেরই নাথুরাম চৌধুরীর নামীয় পত্র; (গ) ১৭৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে জঞ্জিরা রেওদণ্ডার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে প্রদত্ত সনদ; (ঘ) ১৭৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীধরকে প্রদত্ত সনদ।

প্রথম দলিলখানিতে রেওদণ্ডার কামাবিস্‌দারকে নিম্নলিখিত হারে মোহতর্ফা আদায় করিতে বলা হইয়াছে—

(১) কোলীদিগের নিকট হইতে পাল্কীর আয়তন অনুসারে পাল্কীপ্রতি ৮৲, ৫৲ ও ২৲ হিসাবে কর লইবে। (মহারাষ্ট্রের অনেক পার্ব্বত্য পথে গাড়ী চলে না; ঐ সকল জায়গায় পাল্কীতে করিয়া পণ্যদ্রব্য বহিয়া লইয়া যাওয়া হয়।) (২) দোকানদারদিগের নিকট হইতে বার্ষিক দোকানপ্রতি ৫৲, ৬৲ ও ৭৲ হিসাবে। (৩) লোহকারদিগের নিকট হইতে দোকানপ্রতি বার্ষিক ৪৲, ৫৲ ও ৬৲ হিসাবে। (৪) চামারদিগের নিকট হইতে দোকানপ্রতি বার্ষিক ৪৲ হিসাবে। (৫) তৈলিক-দিগের নিকট হইতে ঘানিপ্রতি বার্ষিক ৫৲, ৬৲ ও ৭৲ হিসাবে। (৬) সোনারদিগের নিকট হইতে দোকানপ্রতি বার্ষিক ৩৲ হিসাবে। (৭) কুমারের নিকট হইতে চাকপ্রতি বার্ষিক ৩৲ হিসাবে। (৮) সাজিনির্ম্মাতাগণের নিকট হইতে ঘরপ্রতি বার্ষিক ৩৲ হিসাবে। (৯) গোন্ধলী (শীতলা দেবীর উপাসক)-দিগের নিকট হইতে বার্ষিক ৩৲ হিসাবে ব্যবসায়-শুল্ক। (১০) প্রত্যেক ছোট সওদাগরী নৌকাপ্রতি ।০ ও বড় নৌকার প্রত্যেকখানার জন্য ॥০ আনা হিসাবে কর আদায় করিবে। নাথুরাম চৌধুরীকে বেলদার (পাথরের মিস্ত্রী)-দিগের নিকট

হইতে তাহাদের আয়ের শতকরা ৫৲ হিসাবে মোহতর্ফা আদায় করিতে বলা হইয়াছিল। রেওদণ্ডার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মোরজী শিন্দের সনদে রাজমিস্ত্রী, পাথরের কারিগর ও খনক-দিগের মোহতর্ফার হার দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ব্যবসায়ের জন্য মাসে মাসে একদিনের আয় সরকারী ট্যাক্স স্বরূপ দিতে হইত। শ্রীধরের সনদে, কাপড় ও মসলার বণিক্‌দিগের নিকট হইতে বলদপ্রতি (ইহারা বলদে চাপাইয়া পণ্য লইয়া যাইত) ১।০ হিসাবে কর আদায় করিতে বলা হইয়াছে। মোহতর্ফার তালিকা এই খানেই শেষ হইল।

জকাত

জকাত পণ্য-শুল্কের সাধারণ নাম। ইহাকে মোটামুটি চারি ভাগ করা যায়। (১) থলভরিত—বোঝাই করিবার জায়গায় দেয় কর। (২) থলমোড়—পণ্য বিক্রয়ের স্থলে দেয় শুল্ক। (৩) ছাপাই বা শীলমোহর করিবার কর। (৪) হাশীল। এতদ্ব্যতীত শিঙ্গ শিঙ্গোটী নামক একটি করও কখন কখনও জকাত হিসাবে আদায় করা হইত।

প্রত্যেক পরগণায় পৃথক্-পৃথক্ ভাবে জকাত আদায় করা হইত। যদি বণিকের পণ্য দশটি বিভিন্ন পরগণার মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে হইত, তবে তাহাকে দশ দশবার জকাত দিতে হইত; জকাত দিবার জন্য তাহাকে দশ দশটি বিভিন্ন জায়গায় থামিতে হইত। ইহাতে বাণিজ্যের বড়ই অসুবিধা হইত।

কিন্তু এই অসুবিধা যে মহারাষ্ট্রেরই বিশেষত্ব, তাহা বলা যায় না। ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সে এবং জলভারিণের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ দেশেও বণিক্‌দিগকে ঠিক এই একই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। প্রভেদের মধ্যে এই যে, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এই অসুবিধা এড়াইবার উপায় ছিল না,—মহারাষ্ট্রে ছিল। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বলেন যে, "এই অসুবিধা দূরীকরণের নিমিত্ত সহরে 'হুণ্ডিকরী' নামে এক শ্রেণীর লোক ছিল। ইহারা এক জায়গায় কর দিয়াই পণ্য চালাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিত। জকাতের ইজারাদারগণের সহিত ইহারাই বন্দোবস্ত করিত; এবং দেয় করের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করিত।" পেশবা-সরকারও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি পত্রে বালাজী বাজীরাও হুকুম দিয়াছিলেন যে, বুরহাণপুর হইতে সিরোঁজ ও সিরোঁজ হইতে বুরহাণপুর পর্য্যন্ত যে-সকল মাল চালান হইবে, তাহার জকাত বিভিন্ন স্থানে আদায় না করিয়া, একস্থানে তহশীল করিতে হইবে।

পেশবা-প্রাধান্যের প্রথম যুগে জকাত আদায়ের ভার ছিল ইজারাদারদিগের হস্তে। ইহারা অগ্রিম টাকা দিয়া জকাতের ইজারা কিনিয়া লইত। ইজারার সর্ত্ত অনুসারে কাহারও উপর জুলুম বা কাহারও নিকট হইতে বে-আইনী কোন টাকা আদায় করিবার অধিকার ইহাদের ছিল না। কিন্তু পেশবা-সরকার যেমন কৃষকদিগকে নানা প্রকারে উৎসাহ দিয়া কৃষি-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন, বণিক্ ও শিল্পীদিগকে নানা প্রকারে উৎসাহিত করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের দিকেও

তাঁহাদের সেইরূপ দৃষ্টি ছিল। ইজারা-প্রথা ইহার প্রতিকূল ; এই নিমিত্ত দ্বিতীয় মাধবরাওয়ের শাসনকালে জকাতের হার-নির্দ্ধারণ ও তহশীলের জন্য কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা কখনও কখনও বা ইজারাদার-দিগকে উঠাইয়া দিয়া নিজেরাই তহশীল করিতেন, আবার কখনও কখনও ইজারাদারদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। জকাতের তহশীলদারেরাও কামাবিস্ পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিতেন। ইঁহাদিগকেও কতকগুলি জমিদার ও দরকদারের সহযোগিতা গ্রহণ করিতে হইত। ইঁহাদের হিসাবও কামাবিস্-দারের হিসাবের মত দুই তিনজন বিভিন্ন দরকদারের হাত দিয়া যাইত। ইঁহাদের আদেশ-পত্রও কামাবিস্‌দারের আদেশ-পত্রের ন্যায় বিভিন্ন লোক সহি ও মোহর করিত। এই প্রথার দোষ-গুণ ও সুবিধা-অসুবিধার বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে,—এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি হইলে কৃষির উন্নতির জন্য মারাঠা কৃষক সরকারী খাজনা রেহাই পাইত। বাণিজ্যের প্রয়োজনে মারাঠা বণিকও জকাত হইতে অব্যাহতি না পাইত, এমন নহে। ১৭৬৩-৬৪ সালে ঘি, তৈল, গুড় ও হলুদের আমদানী বাড়াইবার জন্য পেশবা-সরকার জকাতের হার অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছিলেন। ১৭৭০ সালে বণিক্‌দিগের অসুবিধার নিমিত্ত পুণা সহরে নবপ্রবর্ত্তিত তাগ নামক একটি কর রহিত করা হয়। কিন্তু পেশবা-সরকারের মনোযোগ কেবল বণিক্‌দিগের সুবিধার দিকেই নিবদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের সুবিধা অসুবিধাও

তাঁহারা বিশেষরূপে বিবেচনা করিতেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইহাদেরই প্রয়োজনের অনুরোধে, পেশবা-সরকার পুণা ও জুন্নরের জকাত কামাবিস্‌দারের নিকটে লিখিয়াছিলেন—

১। কোঙ্কণ হইতে সমাগত চাউল, লবণ ও মসলার নিমিত্ত জকাত গ্রহণ করিও না।

২। ভূসারী শস্যের (ডাল) নিমিত্ত কখনও জকাত লওয়া হইবে না।

৩। পুণা হইতে যে সকল কৃষক শস্য ও লবণ লইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকেও জকাত দিতে হইবে না; কারণ, সম্প্রতি যুদ্ধে তাহাদের সম্পত্তি-নাশ হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চারি দশকে ইংরেজ রাজনীতি-বিদেরা দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য কেবল শস্যের আমদানী-কর বাজারদরের অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করিতেন; কিন্তু পেশবা-সরকার দুর্ভিক্ষের কালে আমদানী-কর একেবারে রহিত করিয়া দিতেন। তথাপি পেশবা-যুগে সময়ে-সময়ে মহারাষ্ট্রের কোন-কোন অংশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; তাহার সাক্ষ্য পেশবা-যুগের অসংখ্য দলিল-পত্রে বর্ত্তমান। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, মহারাষ্ট্রে তখন রাস্তা-ঘাটের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না;—অল্প সময়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশে খাদ্য আমদানী করিবার উপায় ছিল না। খেয়া নৌকা, খেয়া ঘাট ও রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া পেশবা-সরকার এই অসুবিধা দূরীকরণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত পথঘাটের অবস্থাও যে একেবারে মন্দ ছিল না, তাহার সাক্ষ্য ইংরেজ সেনাপতি

স্যার আর্থার ওয়েলেস্‌লির (পরে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন) ডেস্প্যাচে পাওয়া যায়। কিন্তু তখনকার ভাল এখনকার মন্দের সহিতও তুলনীয় নহে। আর কেবল রাস্তা থাকিলেই হইল না;—দ্রুতগামী যানের তখন একেবারেই অভাব ছিল। এই নিমিত্তই পেশবা-সরকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও, দুর্ভিক্ষের ক্লেশ হইতে প্রজাদিগকে একেবারে মুক্তি দিতে পারেন নাই।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, পেশবা-সরকার কৃষির উন্নতির নিমিত্ত কৃষকদিগকে কৌল দিতেন। এই নীতিরই অনুসরণ করিয়া, তাঁহারা নূতন বাজার স্থাপন, এবং পুরাতন বাজারের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত, বণিক্‌দিগকে নানা প্রকারের কর হইতে অব্যাহতির কৌল দিতেন। ১৭৫০ সালে কসবা মুসখেড়ের পুরাতন বাজারের উন্নতির নিমিত্ত শেটে মহাজন ও দোকানদারেরা এইরূপ কৌল পাইয়াছিলেন; এই কৌল অনুসারে মুসখেড়ের পুরাতন অধিবাসীরা তিন বৎসরের নিমিত্ত আমদানী ও রপ্তানী কর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। ইহাদিগকে কেবল মাত্র ঘরের খাজনা দিতে হইত। আর, নবাগত দোকানীরা পাঁচ বৎসরের জন্য আমদানী ও রপ্তানী কর এবং তিন বৎসরের জন্য ঘরের খাজনা রেহাই পাইয়াছিল। ১৭৪৮ সালে কসবা বরসীর নিকটে একটি নূতন বাজার স্থাপনের নিমিত্ত দোকানদার ও মহাজনদিগকে সাত বৎসরের জন্য সর্ব্ব প্রকারের কর হইতে অব্যাহতি দিয়া কৌল দেওয়া হইয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বুরহাণপুরের হবিলদাস গুলাবদাস নামক একজন

ব্যবসায়ী একখানি নূতন কাপড়ের দোকান খুলিবার জন্য অর্দ্ধেক হাশীল রেহাই পাইয়াছিল। বড়-বড় সওদাগরগণ পেশবার রাজ্যে বাস করিতে আসিলে, তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত করা হইত। বিঠোজী কৃষ্ণ কামত নামক একজন শেনবী বণিক পাঁচখানি বাণিজ্যপোত লইয়া, বেসিন বন্দরে বাণিজ্যের নিমিত্ত বসতি করিতে আসিয়া, পেশবা-সরকারের নিকট হইতে পাল্‌কী ও পোষাক পাইয়াছিলেন। কৃষকদিগের ন্যায় বণিকেরাও উত্তমর্ণদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে, পেশবা-সরকার তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হইতেন।

নূতন বাজার স্থাপন করিবার ভার পড়িত, একজন উদ্যোগী মহাজনের উপর। বাজার স্থাপিত হইলে, গ্রামের পাটীলের মত, ইনিই সেখানকার কর্ত্তা হইতেন; এবং সরকার হইতে শেটেপণের বতন পুরস্কার পাইতেন। ইঁহার কর্ত্তব্য এবং পাওনা অনেকটা পাটীলের কর্ত্তব্য এবং পাওনার অনুরূপ। বাজারের দোকানদারেরা আপদ-বিপদে ইঁহারই দ্বারস্থ হইত। রাজসরকারে তাহাদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা শেটে মহাজনই করিতেন; সুতরাং দোকানদারেরা তাঁহার পাওনাটা বিনা আপত্তিতে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান করিত, সন্দেহ নাই। নিম্নে পাটীলের পাওনার সহিত তুলনার জন্য শেটে মহাজনের পাওনার একটি তালিকা দেওয়া গেল।

১। প্রত্যেক হাটবারে প্রতি বাণিয়া দোকান হইতে একটি সুপারী।

২। পানের দোকান হইতে প্রতি দিন পাঁচটি পান।

৩। প্রত্যেক তৈলের দোকান হইতে প্রতি সপ্তাহে ৯ ছটাক তৈল।

৪। বিক্রীত ছালা প্রতি আধসের ছোলা।

৫। বিক্রীত ছালা প্রতি এক পোয়া মসলা।

৬। তরকারির দোকান প্রতি এক মুষ্টি তরকারী।

৭। প্রত্যেক তন্তুবায়ের নিকট হইতে প্রতি বৎসর একখানি পাসোড়ি (এক প্রকারের মোটা কাপড়)।

৮। চামারদিগের নিকট হইতে বৎসর প্রতি দুই জোড়া জুতা।

৯। দশরা, দেওয়ালী, শিমগা (হোলি) ও বর্ষ প্রতিপদ উপলক্ষে প্রত্যেক দোকান হইতে এক পোয়া আটা অথবা চাউল।

১০। শেটের পালা দিয়া ওজন করা প্রত্যেক ছালা প্রতি এক মুষ্টি শস্য।

১১। কসাই এবং জেলেরা বাজারে শুট্‌কি মাছ এবং মাংস বিক্রয় করিতে আসিলে, তাহার কিছু কিছু শেটে মহাজনের পাওনা।

১২। বাজারের প্রত্যেক বিবাহ উপলক্ষে আধখানি নারিকেল।

১৩। শেটে মহাজনকে ঘরের খাজনা দিতে হইত না।

আজকাল য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার শিল্পীদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, উদাসীন-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। পেশবা-সরকার কিন্তু এই বিষয়ে

একেবারে উদাসীন ছিলেন না। তাঁহাদের দস্তখত ব্যতীত কোন বাণিজ্য পোত বন্দরে প্রবেশ করিতে অথবা বন্দর ত্যাগ করিতে পারিত না। তাঁহারা বাটখারা ও ওজন পরীক্ষা করিয়া শীলমোহর করিয়া দিতেন। সরকারী ছাপ না থাকিলে কোন বাজারে কাপড় বিক্রয় হইত না। পাগ্ড়ীর কাপড় ১৫ হাত কি ত্রিশ হাত হইবে, জরি কেমন ধাতু দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে, রেশমের সহিত কোন্ জাতীয় ক্ষার ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও পেশবা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন; এবং শিল্পীকে এই নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইত। কখন. কখনও পেশবা-সরকার অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের বাজারদর বাঁধিয়া দিতেন। বর্ত্তমান কালের অর্থনীতিবিদের চক্ষে অবশ্য পেশবা-সরকারের শিল্পবাণিজ্যে এবম্বিধ হস্তক্ষেপ নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, য়ুরোপেও তখনও উদাসীন-নীতির উদ্ভব হয় নাই, অবাধ-বাণিজ্য-নীতির ভবিষ্যৎ জন্মভূমি ইংলণ্ডে তখন রক্ষা-শুল্কের অবাধ-প্রচলন। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, পেশবা-সরকারের বাণিজ্যনীতির ফল একেবারে মন্দ হয় নাই। বিদেশেও তাঁহাদের বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মারাঠা বণিক্ তখন আরবের উপকূলে মস্কট বন্দরে পণ্যশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিল,—মারাঠা বাণিজ্যপোত তখন বিবিধ পণ্য বহিয়া চীন ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করিত।

আবকারী বিভাগ হইতে আয়ের উল্লেখ না করিলেও চলে। ব্রাহ্মণ পেশবাগণ মদ্য বিক্রয় ও মদ্য প্রস্তুতের বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণের নিকট মদ বিক্রয় করিলে গুরুতর দণ্ড পাইতে হইত।

কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর অনেক হিন্দু ও পেশবার পর্ত্তুগীজ এবং খৃষ্টান সৈনিকেরা মদ্যপান করিত বলিয়া, মহারাষ্ট্রের মদ্যব্যবসায়ীরা অল্প পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত করিবার অনুমতি পাইয়াছিল।

পেশবা-সরকারের আয় কত ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। স্কট ওয়ারিং অনুমান করেন যে, পেশবার ভাণ্ডারে রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর ১৯০,৬৭৯,৩৯৮ টাকা আসিত। এই অনুমানের ভিত্তি কি, তাহা আমরা জানি না; সুতরাং ইহা কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহাও বলিবার উপায় নাই। এলফিনষ্টোন একটি হিসাব দিয়াছেন কিন্তু তখন সাম্রাজ্যের আয়তন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বিচার বিভাগ

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে নির্ব্বাসিত হন। পেশবাদিগের রাজ্যচ্যুতির সময় হইতে সাতারার ছত্রপতি প্রতাপসিংহ মহারাজ ইংরেজ সরকারের সামন্ত-নৃপতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ছত্রপতি প্রতাপসিংহ নিজের ক্ষুদ্ররাজ্যের শাসন-পদ্ধতিকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ দিবার জন্য একখানি "য়াদী" বা স্মারক পত্র সঙ্কলন করেন। এই "য়াদী"তে মারাঠা সাম্রাজ্যের শাসন-পদ্ধতি-বিষয়ক যাবতীয় নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ভাস্কর বামন ভট মহাশয় এই য়াদীখানি সংগ্রহ করিয়া পুণার "ভারত-ইতিহাস-সংশোধক মণ্ডলে"র তৃতীয় সম্মিলন বৃত্তে ছাপিয়া দিয়াছেন। এই য়াদীর ন্যায়াধীশ-প্রকরণ হইতে মারাঠা-সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে।

ছত্রপতি প্রতাপসিংহ ন্যায়াধীশ-প্রকরণে বলিতেছেন,—"প্রতিবেশীদিগের চেষ্টায় সকল বিবাদের আপোষে মীমাংসাই হইতেছে এই রাজ্যের প্রাচীন প্রথা। আপোষে মীমাংসা না হইলে তখন পঞ্চায়েত ডাকিবে।" তিনি তাঁহার রাজ্যের পাটীল, মাম্‌লত্‌দার ও শেটে মহাজনদিগকে ছোট-বড় সকল মোকর্দ্দমারই আপোষ-মীংমাসার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চগণকে তিনি ভরসা দিয়াছেন যে, আপোষ-

মীমাংসা হইলে আর তাহাদিগকে রাজসরকারে "হরকী" বা বিচার-খরচা যোগাইতে হইবে না। তিনি আরও বলিতেছেন যে, সরকারের এই আর্থিক লোকসানের জন্য সালিশদিগের ভীত হইবার কারণ নাই। তাঁহারা নির্ভয়ে তাঁহাদিগের প্রতি-বেশীদিগের বিবাদের সালিশী করিবেন।

আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, তখন অবশ্য সরকারী আদালতের আশ্রয় লইতে হইবে। গ্রামের পাটীলই সেখানকার বিচার-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী। তাহার উপর মাম্‌লত্‌দার তাহার উপর সরসুভেদার; এবং বিচার-বিভাগের একেবারে শীর্ষস্থানে রাজা অথবা তাঁহার প্রতিনিধি পেশবা। পেশবার এত কাজ যে, তিনি বিচার-কার্য্যের দিকে দৃষ্টি দিতে পারিতেন না। তাঁহার পক্ষে বিচার সম্পর্কীয় যাবতীয় কাজ করিতেন পুণার প্রধান ন্যায়াধীশ বা মারাঠা-সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি। বাছিয়া বাছিয়া ন্যায়নিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে ন্যায়াধীশের পদে নিযুক্ত করা হইত। প্রথম মাধবরাওয়ের ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রীর তেজস্বিতা ও ন্যায়নিষ্ঠার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের তুলিকায় অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু রামশাস্ত্রীই মারাঠা-সাম্রাজ্যের একমাত্র ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি নহেন। তাঁহার গৌরবের প্রখর জ্যোতিঃতে অপর সকলের গৌরব ম্লান হইলেও, তাঁহারা পাণ্ডিত্যে, অপক্ষপাত বিচারে কাহারও অপেক্ষা কম যোগ্য ছিলেন না। রামশাস্ত্রী হইতে মারাঠা সাম্রাজ্যের শেষ বিচারপতি বালকৃষ্ণশাস্ত্রী টোকেকর পর্য্যন্ত সকলেই পণ্ডিত, সকলেই ন্যায় পরায়ণ।

প্রধান বিচারপতি ব্যতীত আরও কতকগুলি ন্যায়াধীশ ছিলেন—তাঁহাদের বিচারালয় ছিল বড় বড় নগরে। ইঁহারাও সকলেই পণ্ডিত এবং ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত তখনকার দিনে কেহ ভাল বিচারক হইতে পারিত না; কারণ, মারাঠা রাজ-পুরুষগণ এখনকার মত ধারাবদ্ধ ভাবে (codified) দেশের আইন সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। বিচার হইত মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বৃহস্পতি, গৌতম, বৌধায়নের বিধান অনুসারে,—অথবা দেশের আবহমানকাল হইতে প্রচলিত প্রাচীন প্রথা অনুসারে। এই সম্পর্কে আর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। পাটীল হইতে পেশবা পর্য্যন্ত কেহই খাঁটি আইনজ্ঞ বিচারক নহেন। এখনকার মত বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের পার্থক্য তখনকার দিনে স্বীকৃত হয় নাই। পেশবা-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রধান সেনাপতি তো বটেনই; তাহার উপর আবার তিনি প্রধান বিচারপতিও। পাটীল বেচারার ত কাজের অন্ত নাই;—খাজনার হার নির্দ্ধারণ করিবে সে, খাজনা আদায় করিবে সে—গ্রামের পুলিশের কর্ত্তা সে,—গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে তাহাকে; তদুপরি বোঝার উপর শাকের আঁটি—আবার এই বিচারের কাজ। সহরের ন্যায়াধীশরা আধুনিক হিসাবেও খাঁটি বিচার-বিভাগের লোক। বিচার ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কর্ত্তব্য নাই। শাসন-বিভাগের কোন কাজে তাঁহাদের হাত দিতে হইত না।

গ্রামের মামলা প্রথমে আসিত পাটীলের নিকটে। পাটীল গ্রামের ম্যাজিষ্টর বটেন এবং এ কালের ম্যাজিষ্টরের মত তাঁহার

বিচার করিবার ক্ষমতাও ছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কেহই আশা করিত না যে, তিনিই মামলার বিচার করিবেন। মামলার নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করিয়া তাহা সফল না হইলে, বিচারের জন্য পঞ্চায়েত ডাকিলেই দেওয়ানী মামলায় তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইত।

পক্ষদিগকে তখন একটা রাজীনামা সহি করিতে হইত যে, পঞ্চায়েতের বিচার তাঁহারা বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইবেন, তারপরে পঞ্চায়েত মহাশয়েরা বিচার আরম্ভ করিতেন, সাক্ষ্য লইতেন, উভয় পক্ষের জবানবন্দীর একটা সংক্ষিপ্ত-সার সঙ্কলন করিতেন; তারপর রায় দিতেন। রায়টা অবশ্য মাম্‌লত্‌দারের সমর্থন ব্যতীত আইনতঃ পাকা হইত না। পঞ্চায়েতেরা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাত বা বিদ্বেষবশতঃ অন্যায় বিচার করিয়াছেন, এরূপ কোন অভিযোগ না হইলে, অবশ্য মামলত্‌দার বা পেশবা-সরকার পঞ্চায়েতের রায় নাকচ করিতে পারিতেন না। এইরূপ অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হইলে কিন্তু আবার নূতন পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইত, নূতন রাজীনামা সহি করিতে হইত; আবার নূতন করিয়া সাক্ষ্য-সাবুদ লইয়া নূতন বিচার হইত। প্রশ্ন হইতে পারে যে, পাটীল যদি পঞ্চায়েত না ডাকেন, তবে মামলার কি হইবে? সে ক্ষেত্রে বাদী মামলত্‌-দারের নিকটে আবেদন করিতে পারিতেন এবং মামলত্‌দার পাটীলকে জানাইয়া পঞ্চায়েত নিয়োগ করিয়া দিতে পারিতেন। পক্ষগণ নিজ গ্রামের পঞ্চায়েতে আপত্তি করিলে, ভিন্ন গ্রাম

হইতেও পঞ্চায়েত ডাকা হইত। মোট কথা, দেওয়ানী মামলার বিচার পঞ্চায়েত দ্বারাই হইত; এবং পঞ্চায়েত না ডাকিয়া কোন পাটীল বা মামলত্‌দার ছোট বড় কোন মামলার বিচার করিলে সে বিচার কতকটা বে-আইনি বলিয়াই পরিগণিত হইত; এবং উৎকোচের অভিযোগ ব্যতীত পঞ্চায়েতের রায় রদ হইত না।

পঞ্চায়েতের বিচার কতকটা জুরির বিচারের মত; কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। এখনকার জুরিদিগের সহিত একজন জজ থাকেন—তিনি জুরিদিগকে মামলা বুঝাইয়া দেন—আইন বুঝাইয়া দেন। মামলা সম্বন্ধে আগে হইতে একটা ধারণা লইয়া আসিলে, তাঁহাকে আর জুরির আসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয় না, সেকালের মহারাষ্ট্র পঞ্চায়েতেরা ছিলেন বাদী প্রতিবাদিগণেরই স্বগ্রামবাসী। সুতরাং মামলার সকল কথা স্বভাবতঃই তাঁহাদের জানা থাকিত। তদুপরি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হইত যে, তাঁহারা একালের সালিশদিগের মত পক্ষগণের দ্বারাই মনোনীত হইতেন। তখন তাঁহারা যে একটু পক্ষপাতিত্ব, একটু ওকালতি না করিতেন, এমন নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেকালের পঞ্চায়েতেরা জজ, জুরি ও উকিল এই তিন জনেরই কাজ করিতেন।

প্রাচীন এথেন্সের নাগরিকেরাও বিচারকের কাজ করিতেন। তাঁহারা এই কাজের জন্য দৈনিক পারিশ্রমিক পাইতেন। মারাঠা পঞ্চায়েতেরা তাঁহাদের বিচার সম্পর্কীয় কার্য্যের জন্য কোন পারিশ্রমিক পাইতেন কিনা সন্দেহ। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌

আপীলের বিচারও হইত পঞ্চায়েতের দ্বারা। মামলত্‌দার বা পেশবা-সরকারের অন্য কোন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বিনা পঞ্চায়েতে আপীলের মামলার বিচার করিতে পারিতেন বটে; কিন্তু তাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ বলেন,—"Though it rested with him to decide whether or not the case required a Panchayet, yet it was reckoned gross injustice to refuse one on a question at all doubtful, and it was always reckoned as sufficient for ordering a new investigation when there had been no Panchayet." অর্থাৎ কোন মামলার জন্য পঞ্চায়েত ডাকা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা যদিও রাজকর্ম্মচারীর ছিল, তথাপি সন্দেহ স্থলে পঞ্চায়েত না ডাকা নিতান্ত অবিচারের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত এবং ইহাই পুনর্বিচারের জন্য পর্য্যাপ্ত কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

পঞ্চায়েত-প্রথার জন-সমাজে এই আদর দেখিয়া মনে হয় যে, সাধারণতঃ এই অব্যবসায়ী বিচারকদিগের হাতে বিচার-বিভ্রাট বড় হইত না। তাঁহারা সাধারণতঃ আইনের খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি দিতেন না, তাঁহাদের চেষ্টা ছিল, একটা স্থায়ী মীমাংসার জন্য; এবং পক্ষদিগের মধ্যে পুনরায় যাহাতে বাদ-বিসংবাদ না হয়, তাহার দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিত। এই নিমিত্ত তাঁহারা কখনও কখনও মামলা হারিবার পরও বাদী বা প্রতিবাদীকে দুই এক টুকরা জমি দিয়া দিতেন। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ মালোজী বিন সাহাজী ভাঙ্গা বাদী, হিরোজী বিন নরসোজি ভাঙ্গা বিবাদী নামক একটি মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মামলাটি হইয়াছিল একটি পাটীলকি-বতনের স্বত্বাধিকার লইয়া। প্রতিবাদী হিরোজী নিজের দাবী প্রমাণ করিতে অসমর্থ হইলেও, ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য, পঞ্চায়েত-দিগের অনুরোধে বাদী মালোজী তাহাকে ৩০ বিঘা জমি ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ইহা হইতে মনে হয় যে, পঞ্চায়েতগণ বোধ হয় সাধারণতঃ উৎকোচ গ্রহণ করিতেন না। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ কিন্তু অন্যরূপ বলেন। তাঁহার মতে, পঞ্চায়েতরা উৎকোচ গ্রহণ এবং অন্যায় পক্ষপাত এই উভয় দোষে দোষী ছিলেন,—"The Panchayets themselves were open to corruption and to partiality." এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ যে সময়ের কথা তাঁহার রিপোর্টে আলোচনা করিয়াছেন, তখন মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তিম দশা উপস্থিত, দেশ অরাজক। তৎপূর্ব্বেই দুর্ব্বুদ্ধি বাজীরাও রঘুনাথের উৎপাতে মারাঠা দেশের অমন সুন্দর পল্লীসমাজ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তখনকার কথা মারাঠাদিগের সুখসমৃদ্ধির দিনের প্রতি প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। বিশেষতঃ, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ সাহেব তাঁহার রিপোর্টে, পেশবার নিকট হইতে বিজিত দেশের শাসন-পদ্ধতির সহিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতির তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-প্রথার উৎকর্ষই প্রায় সর্ব্বদা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং, বিজিত দেশের শাসন-প্রথার রীতি-নীতির

অপকর্ষ প্রমাণ করিবার ইচ্ছা দ্বারাও তিনি কখনও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হইয়াছিলেন, ইহা মনে করা অনুচিত বা অসঙ্গত নহে। মারাঠা বাদী-প্রতিবাদী পঞ্চায়েত-দিগকে "তুম্মী পঞ্চমায়বাপ" বলিয়া সম্বোধন করিত। সাধারণের ভাষায় পঞ্চায়েতরা ছিলেন, "পঞ্চ পরমেশ্বর"। তাঁহাদের অপক্ষপাত বিচারে বিশ্বাস না থাকিলে, তাঁহাদের ন্যায়পরায়ণতায় বিশ্বাস না থাকিলে, তাঁহাদের সততায় বিশ্বাস না থাকিলে, মহারাষ্ট্রের পল্লীবাসিগণ পঞ্চায়েতদিগকে মাতাপিতা বলিয়া সম্বোধন করিবে কেন? পরমেশ্বরের আসনে বসাইবে কেন? তাঁহাদের বিচার পরমেশ্বরের বিচার বলিয়া মানিবে কেন?

এখন দেখা যাউক, 'পঞ্চায়েত' নির্ব্বাচিত হইত কাহারা। এই প্রবন্ধে ভাঙ্গা বনাম ভাঙ্গা নামক একটি মামলার উল্লেখ করিয়াছি। এই মামলার বিচার করিয়াছিলেন—দেশমুখ, দেশপাণ্ডে এবং 'গোত'গণ। "গোত" বলিতে স্বজাতি অথবা কুটুম্বদলের সমষ্টি বুঝায়। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ বলেন যে, সীমানার মামলায় পাটীল, দেশমুখ, দেশপাণ্ডে ও মহারদিগকে লইয়া পঞ্চায়েত গঠিত হইত। অন্যান্য মামলার সারাংশ পড়িয়া মনে হয় যে, বতনের মামলায় নিকটস্থ পল্লীর পাটীলগণ ও পরগণার জমিদারেরাও পঞ্চায়েতে আসন পাইতেন। অর্থাৎ এমন সকল লোককে বিচার করিতে ডাকা হইত, যাঁহারা দেশের নিয়ম-পদ্ধতি, প্রাচীন প্রথা প্রভৃতির কথা ভাল করিয়া জানিতেন। রাও বাহাদুর চিম্‌নাজি বাড্ সঙ্কলিত 'সনদ ও পত্র' নামক

গ্রন্থে একটি 'মজলিস্' সম্পর্কীয় দলিল ছাপা হইয়াছে। ঐ দলিলে মজলিসের সভ্যদিগকে বৃত্তিধারী এবং সম্পত্তি ও তৎসম্পর্কীয় আইনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই রীতি অনুসারেই পৌরোহিত্য সম্পর্কীয় একটি মামলার (অপাণা ভট বনাম শ্রীপত ভট) বিচারের ভার পড়িয়াছিল কর্হাডের ব্রাহ্মণ সমাজের উপর এবং সাক্ষ্য দিতে ডাকা হইয়াছিল, যোশী বা পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগকে।

দেওয়ানী মামলায় মৌখিক সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হইত, আবার দলিল-দস্তাবেজও পরীক্ষা করা হইত। এতদ্ব্যতীত, প্রাচীন হিন্দুবিধি অনুসারে অগ্নিদিব্য, তুলাদিব্য প্রভৃতি ক্রিয়ার সাহায্যেও বিচার চলিত। অধুনালুপ্ত অগ্নিদিব্য প্রভৃতির আলোচনা পরে করা যাইবে। এখন দেখা যাউক, মৌখিক সাক্ষ্য দিতে ডাকা হইত কাহাদিগকে। সে কালের পল্লী-সমাজের কোনও লিখিত ইতিহাস ছিল না। কিন্তু পেশবা-দপ্তরে রক্ষিত মামলা-মোকর্দ্দমার সারাংশ পড়িলে দেখা যায় যে, মারাঠা পল্লীর প্রত্যেক বতনের প্রাচীন ইতিহাস কিরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইত। প্রত্যেক পল্লীবৃদ্ধ, পল্লী-সমাজের প্রত্যেক কর্ম্মচারী এই ইতিহাস জানিতেন। বাল্যে তাঁহারা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠগণের নিকটে এই ইতিহাস শুনিয়াছিলেন। ঐ জ্যেষ্ঠগণ আবার তাঁহাদের বাল্যে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকট পল্লী-ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রত্যেক মারাঠা পল্লীর বিভিন্ন

পরিবারের সুখদুঃখের, উত্থানপতনের বিচিত্র কাহিনী, দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করুণ ইতিহাস, অজন্মা, অনাবৃষ্টি, অরাজকতা, অত্যাচার, যুদ্ধবিগ্রহ, অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন ও মড়কের কথা অলিখিত থাকিয়াও লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এই জন্য প্রত্যেক বতনের মামলায়, স্বত্ব-সাব্যস্তের মামলায় এই সকল পল্লীবৃদ্ধ ও পল্লীসমাজের কর্ম্মচারী পাটীল, কুলকর্ণী, আলুতা ও বলুতাগণ সাক্ষ্য দিতে আহূত হইতেন। এই সাক্ষীদিগের মধ্যে সংখ্যায় বেশী থাকিত বলুতাগণ। প্রাচীন দলিল হইতে তিনটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে সুপা পরগণার অন্তঃপাতী জালগাঁওয়ের যোশী ও কুলকর্ণী স্বত্বাধিকার লইয়া মামলা হয়। প্রতিবাদী দাদো শিবদেব গ্রামবাসিগণের বিচারে সম্মত হইয়া রাজীনামা লিখিয়া দেন। তদনুসারে নিম্নলিখিত "পণ্ঢর" বা গ্রামবাসিগণ সাক্ষ্য দিতে আহূত হইয়াছিলেন।

১। সুলতানজী বিন দরিয়াজী পাটীল

২। লিম্বাজী বিন মানকোজী পাটীল

৩। সুভানজী বিন বাপোজী পাটীল

৪। শেট্যাজী বিন রায়াজী পাটীল

৫। পিরাজী বিন শান্তাজী জবিব চৌগুলা

বলুতা—

১। বালু বিন মানকোজী সুতার

২। সূর্য্যাজী বিন উদাজী লোহার

৩। সুভানজী বিন নাবজী কুম্ভার
৪। উদাজী বিন মানকোজী চাম্ভার
৫। সুভানজী বিন জীবাজী গুরব
৬। বাঘোজী বিন লিম্বাজী কোলী
৭। মলহারজী বিন রাজুহ্নাভী (নাপিত)
৮। মাণিকনাক বিন রাজনাক } মহার
৯। য়েশনাক বিন নিম্বনাক }
১০। সমনাক বিন আজনাক মঙ্গ

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে জাউর্গাওয়ের পাটীলকি বতনের মামলায় গ্রামবাসিগণের সাক্ষ্যে খুব অমিল হয়। এক এক দল এক এক রকম সাক্ষ্য দিয়াছিল। এইজন্য তাহাদের নামের তালিকা সাক্ষ্যের তারতম্য অনুসারে ৬ ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে।

(১)

১। বুদ মালী
২। শিবাজী বিন কোণ্ডাজী হ্নাভী
৩। বজাজী বিন বড়গোজী পরীট (ধুপী)
৪। রায়নাক বিন সয়নাক মহার
৫। হাসা বিন চাঁদনাক মহার

(২)

১। নিম্বাজী বিন জানোজী সুতার
২। বদজী বিন বহিরা চাম্ভার

(৩)

১। সুখমালী শন্তমালী

৭৫ বৎসরের এই বৃদ্ধ অন্য সকলের অপেক্ষা গ্রামের প্রাচীন কথা ভাল জানিত বলিয়া বোধ হয়।

(৪)

নিকটস্থ গ্রামসমূহের পাটীল—

১। কবজী বিন মালজী পাটীল (আম্বেগাঁও বুদ্রুক)

২। রকমাজী বিন মালজী মাটে পাটীল (কডক বসলে)

৩। হেমাজী পাটীল পোলা (ধায়তী)

৪। য়েসজী বিন গোপজী পাটীল বোরটে (বরজে)

৫। য়েসজী বিন য়েলবোজী পাটীল (নর্হে)

৬। অমাই বোরটী পাটলীন। (হিঙ্গণে বুদ্রুক)

(৫)

১। হরা মহার।

২। লিঙ্গনাক বিন পদমনাক (নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এই ব্যক্তি জাতিতে মহার)

৩। রায়া মহার

৪। তবা মহার

(৬)

১। মোরো নরহর কুলকর্ণী

২। হরমালী বিন সন্তমালী

৩। সন্তমালী বিন রাজমালী

৪। শিবমবলা বিন রাউমবলা

৫। দজ বরতা

৬। রায়া বিন রামনাক

৭। তহনাক বিন সন্তনাক

বোধ হয় গ্রামের পাটীলকি বতনের পূর্ব্ব ইতিহাস ইহাদের সকলের সমান জানা ছিল না ; তাই ইহাদের সাক্ষ্যে এইরূপ অমিল হইয়াছিল।

আমাদের তৃতীয় তালিকা একটি মামলার সারাংশ হইতে সঙ্কলিত। তরফ নারায়ণ গাঁওয়ের অন্তঃপাতী খোদদ গ্রামের লোহারকী ও সুতারকী বতনের স্বত্ব লইয়া শিবাজী বিন তাহ্ণাজী গংর সহিত সটবাজীর মামলা হয়। উভয় পক্ষই গ্রাম-বাসিগণকে সাক্ষী মানিয়া রাজীনামা দস্তখত করে ও জামিন দেয়। তদনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বতনের পূর্ব্ব ইতিহাস সম্পর্কীয় জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ইহাদিগকে দুইটি দলে ভাগ করা হইয়াছে। এই তালিকায় প্রত্যেক সাক্ষীর বয়সও লেখা আছে। তালিকাটি পড়িলেই দেখা যাইবে যে, সাক্ষীদিগের মধ্যে বলুতাগণই সংখ্যায় বেশী।

(১)

১। খণ্ডোজী বলদ সুভানজী গাইকবাড বয়স ৪৫

২। বহিরজী বলদ বনোজী কুচিলা " ৩৪

৩।	রামজী বলদ পদজী ঘরমলা	বয়স	৬০
৪।	কচু বলদ খণ্ডোজী গাইকবাড	”	৩৫
৫।	মহাদজী বলদ হরজী য়েবণ্ডা	”	৫০
৬।	গোণ্ডজী বলদ রণোজী রাউত	”	৫৫
৭।	নিম্বাজী বলদ য়েসাজী কুম্ভার	”	৬০
৮।	মলহারজী বলদ উমাজী কোলী	”	৩৫
৯।	হরি বলদ গঙ্গাজী ডবরা	”	৬০
১০।	লোখা বলদ অমাজী চাম্ভার	”	৫০
১১।	য়েসজী বলদ তাহ্নাজী মহার	”	৬০
১২।	উমা বলদ পঙ্গনাক মহার	”	৩৫
১৩।	পেমনাক বলদ য়েসনাক মহার	”	৬০
১৪।	জবজ্যা বলদ সটব্যা মহার	”	২৫
১৫।	লুমা বলদ হেরণা মহার	”	৬০

(২)

১।	জাবজী বলদ গঙ্গাজী পাটীল মোরাট	বয়স	৩৪
২।	সখোজী বলদ সটবাজী মূলে	”	৩৪
৩।	খণ্ডোজী বলদ শেট্যাজী মূলে	”	৬০
৪।	গুণ্ডাজী বলদ পিলাজী পাটীল ধেটে	”	৩৫
৫।	হঙ্গোজী বলদ মালজী ধঙ্গলে	”	৭০
৬।	চবু বলদ মহাদজী পরীট	”	৩৫
৭।	অমন বলদ লক্ষ্মন মালী	”	৫৫
৮।	নাগোজী বলদ মুকলজী মূলে	”	৩৫

৯। জর্‌য়া বলদ নামা মঙ্গ বয়স ২৫

১০। নিম্বাজী পনমন বয়স ২০ এবং তাহার মাতা রখমাই, বয়স ৬৫।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই মামলায় বিজয়ী পক্ষ রাজ-সরকারে "হরকী" স্বরূপ ২০০ টাকা দিয়াছিল।

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই, উভয় পক্ষকেই একখানা রাজীনামা লিখিয়া দিতে হইত যে, তাহারা পঞ্চায়েতের বিচার বিনা ওজরে মানিয়া লইবে। কিন্তু মনের মত রায় না পাইলে, কোন পক্ষেরই ওজর-আপত্তির অসদ্ভাব দেখা যাইত না। পঞ্চায়েতের বিচার না মানিয়া, তখন তাহারা 'দিব্যে'র (ইংরেজীতে যাহাকে ordeal বলে) দাবী করিত। আর এই 'দিব্যে'র দাবীও দুই-একেবারে মিটিত না। পরাজিত পক্ষ যত বার, যত রকমের 'দিব্য'-পরীক্ষার দাবী করিত, ততবার দিব্যের ব্যবস্থা করিয়া, তাহার আবদার রক্ষা করিতে হইত। উদ্দেশ্য বোধ হয় এই ছিল যে,—তাহার মনে কোন প্রকার ক্ষোভেরই কারণ না থাকে। শ্রীযুত ভাস্কর বামন ভট এই দিব্যের বিচার সম্বন্ধীয় কয়েকখানি দলিল, ভারত-ইতিহাস-মণ্ডলের তৃতীয় সম্মেলন বৃত্তে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই একখানা দলিল হইতেই বুঝা যাইবে যে, মামলা হারিয়া মারাঠা বাদী বা বিবাদী কিরূপে বারবার বিভিন্ন প্রকারের দিব্যের দাবী করিতে পারিত। সমগ্র দলিলখানি উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই,—মাত্র একটি অংশ তুলিয়া দিতেছি—"তার পরদিন সোমাজী গোতের বিচারে গররাজী হইয়া বলিল যে, নদী হইতে

গ্রামবাসীরা যাহার হাত ধরিয়া তুলিবে, তাহার দাবীই গ্রাহ্য। তখন তুমি বাবাজী এই ব্যবস্থায় সম্মত আছ কি না জিজ্ঞাসা করায়, তুমি তোমার সম্মতি জানাইলে। তার পরদিন সোমাজী এই 'ক্রিয়ায়' গররাজী হইয়া রঙ্গনগাঁওয়ের মসজিদের দিব্যের কথা প্রস্তাব করিল। তৃতীয় দিবস মসজিদের দিব্য না-কবুল করিয়া সে আবার প্রস্তাব করিল যে, বাদী-প্রতিবাদী পরস্পরের হাতে জল-ঢালাঢালি করিয়া স্থির করিবে, কাহার দাবী ঠিক। তারপর সোমাজী এই প্রস্তাবেও গররাজী হইয়া 'অগ্নিদিব্য' প্রার্থনা করিল।"

উপরে উল্লিখিত 'দিব্যগুলি'র মধ্যে একটিতেও কিন্তু দৈব-বিচারের গন্ধও ছিল না। উভয় পক্ষ কোন পুণ্য-তিথিতে, কোন পবিত্র নদীতটে অথবা কোন পবিত্র স্রোত-সঙ্গমে সমবেত হইত। সেইখানে সমস্ত গ্রামবাসী কোন শুভ মুহূর্ত্তে স্নান করিয়া নদীর তীরে উঠিয়া দাঁড়াইত। বাদী-প্রতিবাদী তখনও নদীগর্ভে দণ্ডায়মান থাকিত। তখন হয় পাটীল অথবা কোন পল্লীবৃদ্ধ সমবেত পল্লীবাসিগণের অনুজ্ঞা অনুসারে বিবাদীয় সম্পত্তির নায্য অধিকারীকে নদী হইতে হাত ধরিয়া তুলিত। নামে দিব্য হইলেও, ইহা কার্য্যতঃ জুরির বিচার বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে। সেকালে লোকের কুসংস্কার ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস যেরূপ প্রবল ছিল, তাহাতে এই প্রথায় অবিচার হইবার আশঙ্কা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। পুণ্য তিথিতে কৃষ্ণা অথবা গোদাবরীর পবিত্র সলিলে দাঁড়াইয়া, সমবেত গ্রামবাসীদের সম্মুখে দেব-ব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া, মিথ্যা আচরণ

করিবার সাহস তখনকার দিনে অতি অল্প লোকেই করিতে পারিত। আর তেমন লোকের উপর এমন বিচারের ভার গ্রামবাসিগণ দিবেই বা কেন? যে আবাল্য সকলের বিশ্বাস-ভাজন, সে বার্দ্ধক্যে পরলোকের প্রান্তে দাঁড়াইয়া কেন এমন কাজ করিবে, যাহার ফল ইহকালে লোকনিন্দা ও পরকালে অনন্ত নরক? পুণা পরগণার অন্তর্গত ফরসঙ্গ গ্রামের পাটীলকি বতনের বিবাদের মীমাংসা এই প্রথায় হইয়াছিল। সমবেত গ্রামবাসী শুচিস্নাত হইয়া,—কৃষ্ণার সৈকতে দাঁড়াইয়া, একনাক নামক এক মহার বৃদ্ধকে 'বতনের' প্রকৃত অধিকারীর হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আদেশ করিয়াছিল।

তখনকার মারাঠা পল্লীতে বহু প্রকারের দিব্য প্রচলিত ছিল। সে সকল আলোচনার সময়ও নাই, স্থানও নাই, কেবল যে দুইটির উল্লেখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক দলিলে পাওয়া যায়—তাহারই বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে। ইহার একটির নাম 'রবা'। দ্বিতীয়টির নাম 'অগ্নি-দিব্য'। ফুটন্ত তৈলপূর্ণ পাত্রের মধ্য হইতে উত্তপ্ত ধাতুখণ্ড বাহির করিয়া আনিবার নাম—'রবা কাঢ়ণে'। বাদী ও প্রতি-বাদী উভয়ের সম্মতি লইয়া এই দিব্যের ব্যবস্থা হইত। দিব্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত—কোন জাগ্রত দেবতার পবিত্র মন্দিরে। সরকার হইতে পাঁজি-পুঁথির সাহায্যে শুভ মুহূর্ত্ত স্থির করিয়া, এই 'দিব্যে'র সময় নির্দ্দেশ করা হইত। আর বাদী-প্রতিবাদীর সঙ্গে থাকিত তাহাদের গ্রামবাসিগণ ও একজন সরকারী কর্ম্ম-

চারী। একখানি মারাঠী দলিল হইতে ‘রবা’র সমসাময়িক বিবরণ তুলিয়া দিতেছি। মামলাটি চলিতেছিল কোন গ্রামের ‘পাটীলকী’ লইয়া। বাদী ও প্রতিবাদীর নাম দেবজী ও শঙ্করাজী ডাঙ্গট। সরকারী রায়ে লেখা আছে—“তারপর রাজশ্রী আপাজী হনমন্ত স্নভেদার, বালাজী দাদাজী এবং বাঘোজী রাউতের সঙ্গে পালীতে অগ্নি-দিব্যের জন্য তোমাদিগকে পাঠান হইল। সেই গ্রামের গোত তথাকার মন্দিরে সমবেত হইয়া অগ্নি জ্বালিয়া ঘি ও তৈল উত্তপ্ত করিল। তুমি স্নান করিয়া, নিজের দাবী যথারীতি জানাইয়া, সকলের সম্মুখে সেই তপ্ত তৈলের ভিতর হইতে দুইখণ্ড ধাতু বাহির করিলে। তার পর তোমার হাত বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার উপর শিলমোহর করা হইল। পরদিন উপরিউক্ত দুই পক্ষকেই মহলের আমলারা হুজুরে লইয়া আসিল। তৃতীয় দিনে মজলিসের সম্মুখে শিল-মোহর ভাঙ্গিয়া হাত খোলা হইল। তোমার হাতে আগেকার দাগ ভিন্ন আর কোন নূতন দাগ দেখা গেল না। তুমি এই দিব্যে জয়ী হইলে।”*

অগ্নি-দিব্যের ব্যবস্থা ইহা হইতে একটু বিভিন্ন। বিচার-প্রার্থীর হাতখানিতে প্রথমে অশ্বত্থ পত্রের আবরণ নূতন সূতায় ভাল করিয়া বাঁধিয়া, সেই পত্রাবৃত হস্তে একটি উত্তপ্ত লৌহ গোলক দেওয়া হইত। সেই তপ্ত ধাতু-গোলক হাতে লইয়া, মৃত্তিকায় অঙ্কিত সাতটি বৃত্তের প্রান্তে উপনীত হইয়া, বিচার-প্রার্থী শুকনা তুঁষের উপর হাতের গোলা ফেলিয়া দিত।

---

* এই দুইখানি দলিলের ভাবগত অনুবাদ দিয়াছি।

তুঁষগুলি জ্বলিয়া উঠিলেই বুঝা যাইত যে, লোহার গোলাটি ভাল করিয়াই গরম করা হইয়াছে, কোন প্রকার প্রতারণা করা হয় নাই। তারপর যথারীতি বিচার-প্রার্থীর হাত পরীক্ষা করা হইত। কোন প্রকারের নূতন ক্ষতচিহ্ন না থাকিলেই, দিব্যে তাহার জয় হইত। বলা বাহুল্য, এই সকল দিব্যের বিচার বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এমন কি, বৃহস্পতির গ্রন্থে অগ্নি-দিব্যের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার সহিত মারাঠা দলিলের অগ্নি-দিব্যের বিবরণের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ ও শুক্র প্রভৃতি প্রাচীন নীতিবিদ্‌গণও এই প্রকার বিচারের অনুমোদন করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্থসঙ্গ ও মুসলমান পণ্ডিত আবু রিহান অল বিরুনির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, শাস্ত্রকারগণের এই ব্যবস্থা কার্য্যতঃ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রতিপালিত হইত। ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, মুঘল সম্রাট্ আকবরের কালেও দিব্যের বিচার প্রচলিত ছিল। ভিনিসীয় পরিব্রাজক নিকোলা মেনুসী ঔরংজীবের রাজত্ব-সময়ে দক্ষিণ-ভারতে 'দিব্যের' প্রচলন লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং ইংরেজ কর্ম্মচারী কর্ণেল ড্রী বলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে এই প্রকারের বিচার প্রচলিত ছিল। সুতরাং মারাঠা রাজ্যেও যে পেশবাদিগের শাসন-কালে এই অদ্ভুত বিচার-পদ্ধতির প্রচলন দেখা যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু এই সকল বিচারের ফলে যে সকল ক্ষেত্রে সত্যের জয় নাও হইতে পারে, তাহা তৎকালীন মারাঠা

বিচারকগণ একেবারে অনবগত ছিলেন না। তাই সাধারণ মামলায় প্রায়ই অগ্নি-দিব্যের ব্যবস্থা হইত না। আর অন্য প্রকারের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে, কখন কখনও অগ্নি-দিব্যের ব্যবস্থায় তখনকার বিচারকেরাও বিরোধী হইতেন। একজন 'সভানায়ক' বা 'পঞ্চায়েতের সভাপতি' একবার সাক্ষ্য প্রমাণ থাকায়, রবা-দিব্যের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, প্রচলিত প্রবাদ-বাক্যের আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—

দিবস অসতা দিবা নাহী।
গোহী অসতা রবা নাহী॥

দিবসে যেমন দীপের প্রয়োজন নাই, সাক্ষ্য থাকিলে তেমনই রবার প্রয়োজন নাই।

বলা বাহুল্য যে, এই সকল দিব্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল সত্যদ্রষ্টা দেবতাদিগের সাক্ষ্য বা বিচার পাইবার আশায়। এই আশায়ই বাদী-প্রতিবাদিগণ কখন-কখনও দেব-মন্দিরে বা মসজিদে উপস্থিত হইয়া, নিজ নিজ দাবীর সমর্থনে শপথ উচ্চারণ করিত। দেবতার বিচার-প্রতীক্ষায় কখন-কখনও সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বা ততোধিক কাল অপেক্ষা করা হইত। যদি এই সময়ের মধ্যে শপথকারীর বা তাহার কোন নিকট আত্মীয়ের কোন শারীরিক বা আর্থিক হানি না হইত, তাহা হইলে ধরিয়া লওয়া হইত যে, দেবতার বিচারে তাহারই জয় হইয়াছে। আর নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ঐরূপ কোন বিপদ ঘটিলে, তাহা মিথ্যাবাদীর প্রতি দেব-রোষের প্রমাণ বলিয়া

গৃহীত হইত। একবার একজন লোক তাহার দাবীর সমর্থনে ভূদেব রাজার (শাহু ছত্রপতির) চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহার পর দুই এক দিনের মধ্যেই তাহার উদরাময় হয়। পীড়িত অবস্থায় বলদের পিঠে করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনা হয়। কিন্তু তাহার প্রতিপক্ষ বলিতেছে, মিথ্যা শপথের ফলে সেই রোগ হইতে সে আর মুক্তি পায় নাই। মাস অতীত হইতে না হইতেই, মিথ্যা দাবীর অপরাধের জবাব দিতে সে আর এক লোকে চলিয়া গেল। গ্রামে গ্রামে সীমানা লইয়া বিবাদ বাধিলে, তাহারও বিচার হইত ঐ 'দিব্যের' রীতিতে। একজন পাটীল গোচর্ম্ম মাথায় লইয়া তাহার বিশ্বাস-মত সীমানার পথে চলিয়া যাইত। নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে তাহার কোন বিপদ না ঘটিলে, সেই সীমানাই খাঁটি সীমানা বলিয়া গৃহীত হইত। এরূপ ক্ষেত্রে একবার কিন্তু একজন পাটীলকে গোচর্ম্ম বহনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল।

বিচার শেষে বিজয়ী পক্ষ পেশবা-সরকার হইতে একখানি 'বতন পত্র' বা 'নিবাড়া পত্র' পাইত; কারণ, বিচার-কার্য্য সকল ক্ষেত্রে সকল সময়েই পেশবার নামে করা হইত। বিজয়ী পক্ষ আসল দলিলখানি লইয়া যাইত; আর তাহার একপ্রস্থ নকল পেশবার দপ্তরে রক্ষিত হইত। সময়ে-সময়ে এই সকল প্রাচীন দলিলের নকল অনেক কাজে লাগিত। মূল দলিল হারাইয়া গেলে, এই নকলের সাহায্যেই স্বত্বের মামলার বিচার হইত। আবার ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে একটি দেশমুখী বতনের মামলায়,

একখানি অতি প্রাচীন দলিলের প্রামাণিকতায় সন্দেহ হইলে, সমান প্রাচীন অপর কয়েকখানি দলিল বাহির করিয়া, তাহার সহিত লেখার প্রণালী ও মোহরের তুলনা করিয়া, তবে ঠিক করা হয় যে, দলিলখানি সত্য-সত্যই বিশ্বাসযোগ্য,—জাল নহে।

খতের নালিশে বাদীকে সরকারে দাবীর টাকার এক-চতুর্থাংশ দিতে হইত। এই প্রথাটি খুব সম্ভব মুসলমান রাজাদিগের নিকট হইতে ধার করা। মনে রাখিতে হইবে, তখনকার দিনে আদালতে উকিল, মোক্তার, টাউট, এজেণ্টের উৎপাত ছিল না; ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফিও দিতে হইত না; সুতরাং সে হিসাবে দাবীর টাকার এক-চতুর্থাংশ খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ, পাওনা আদায় করিতে যখন আদালতের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন সাধারণতঃ হইতই না। সেকালের পাওনাদার দেনাদারের দরজায় ধরণায় বসিত। দেনাদার যত বড় ব্যক্তিই হউন না কেন, দাবীর টাকা না মিটাইয়া দিলে, অথবা 'ধরণাকারী' অন্নজল গ্রহণ না করিলে, তাঁহারও অন্নজল গ্রহণ করিবার উপায় ছিল না। পেশবার দুয়ারে ধরণা দিতেও সেকালের মারাঠা পাওনাদার ইতস্ততঃ করিত না। ব্রুটন বলিয়াছেন যে, কতকগুলি মুসলমান সিপাহী বকেয়া বেতনের জন্য দৌলতরাও সিন্ধিয়ার দুয়ারে ধরণা দিয়াছিল। সুতরাং তাগাদায় ও ধরণায় যে টাকা আদায় হইত না, কেবল সেই টাকাটার জন্যই তখনকার পাওনাদার আদালতের দ্বারস্থ হইত। আর এই জাতীয় পাওনা উসুলের

আশা তাহারা এক প্রকার ছাড়িয়াই দিত। কাজেই, দাবীর টাকার সিকি পরিমাণ সরকারে দিয়াও, বাকী বারো-আনা পাইলেই যে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

যদি দেশের শান্তি ও অশান্তি, চুরি-ডাকাতির সংখ্যা প্রভৃতি দ্বারা ফৌজদারী আদালতের কার্য্যকুশলতার বিচার করিতে হয়, তবে মারাঠা ফৌজদারী হাকিমেরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য খুব নিপুণতার সহিতই সুসম্পন্ন করিতেন বলিতে হইবে। এলফিন্‌ষ্টোন্ লিখিয়াছেন—"The country is peculiarly free from crimes. Gang robberies have never, since I have been in the country, reached to such a pitch as to bear a moment's comparison with Bengal, described in the paper laid before the Parliament." ইহাও হইতে পারে যে, বাঙ্গালায় যে শ্রেণীর বলিষ্ঠ লোক ডাকাতি করিয়া বলবীর্য্যের পরিচয় দিত, মহারাষ্ট্রে সেই শ্রেণীর লোক সেনাদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহে সামরিক যশ অর্জ্জন ও অন্য প্রদেশে নিজেদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিত বলিয়াই, মারাঠা দেশে চুরি-ডাকাতির সংখ্যা এলফিন্‌ষ্টোনের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা অনেক কম হইত। ফৌজদারী মামলার বিচার হইত গ্রামে পাটীলের ও জিলায় কামাবিস্‌দার বা মাম্‌লত্‌দারের নিকটে। প্রান্তের শাসনকর্ত্তা সরসুভাদারের নিকটে আপীলের শুনানি হইত ; আর প্রত্যেক মামলারই

শেষ আপীল ও চূড়ান্ত বিচার হইত পুণার ন্যায়াধীশের আদালতে। দেওয়ানী মামলার মত ফৌজদারী মামলার বিচারে পঞ্চায়েত ডাকার নিয়ম ছিল না। তবে মাঝে মাঝে দুই-একটা খুনী মামলার বিচারেও যে পঞ্চায়েতের সাহায্য লওয়া হইত, তাহার প্রমাণ মারাঠী কাগজপত্রে পাওয়া যায়। শাহু ছত্রপতি ও বালাজী বাজীরাও পেশবার আমলে কোন অপরাধেই সাধারণতঃ প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত না। নরহত্যারও শাস্তি ছিল, অর্থদণ্ড কারাদণ্ড এবং বিত্ত গ্রহণ। সেকালে অর্থদণ্ডের পরিমাণ অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে না হইয়া, দণ্ডিত ব্যক্তির আয়ের অনুপাতে হইত। সমান অপরাধে ধনী ও নির্ধনের অর্থদণ্ডের যথেষ্ট তারতম্য হইত। দণ্ডিত অপরাধীরাও অনেক সময়ে সরকারে আবেদন করিত যে, তাহাদের সম্পত্তির অনুপাতে (জীবন মাফক) অর্থদণ্ডের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হউক। বালাজী বাজীরাওয়ের আমলে রামা নামক এক নরসুন্দর-নন্দনের মিথ্যা অভিযোগের অপরাধে ৪০ টাকা অর্থদণ্ড হয়। ঠিক ঐ পেশবারই শাসন-সময়ে প্রতিনিধির ভ্রাতা হনমন্ত ভটের ১০০০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছিল মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এই তারতম্যের কারণ অনুমান করা কিন্তু কঠিন নহে। শাস্তি দণ্ডিত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের জন্য। সুতরাং যে পরিমাণে অর্থদণ্ড করিলে একজন দরিদ্র ব্যক্তির মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে পারে, অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী ব্যক্তি তাহাতে ভীত হইবে না। এই জন্যই প্রায় সমান অপরাধে এক গ্রাম্য নাপিতের জরিমানা হইল ৪০৲; আর

প্রতিনিধির মত একজন প্রবল ও প্রভাবশালী সামন্তের নিকটতম আত্মীয়ের দণ্ড হইল তাহার পঁচিশ গুণ। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ফৌজদারী আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে দণ্ড হইত; কিন্তু নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইলেও অভিযুক্ত ব্যক্তি বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইত না। তবে দণ্ডিত ব্যক্তির জরিমানার নাম 'গুহ্নাগারী'; আর নির্দ্দোষ ব্যক্তির নিকট হইতে যে অর্থ গ্রহণ করা হইত, তাহার নাম ছিল 'হরকী'। বোধ হয় মতলব এই যে, নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা এক আধটু শাস্তি পাইলেও, দোষী যেন অব্যাহতি না পায়।

মারাঠা আমলে প্রাণদণ্ড খুব বিরল হইলেও, পেশবা মাধবরাও ও নানা ফড্‌নবীশের শাসন সময়ে অপরাধীকে বিকলাঙ্গ করিয়া দেওয়া মোটেই অসাধারণ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত না। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থায়ও, যে অঙ্গ দ্বারা অপরাধ করা হইয়াছে সেই অঙ্গ ছেদন করা অপরাধীর যোগ্য শাস্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। ভিনিসীয় পরিব্রাজক নিকোলাস্ মেনুসী লিখিয়াছেন যে, মুঘল সম্রাট্ ঔরংজীব মদ্য-বিক্রেতাদিগের হস্ত ছেদনের হুকুম দিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের আত্ম-চরিতেও এই প্রকার শাস্তির উল্লেখ আছে। কনিষ্ঠ মাধব রাওয়ের রোজনিশীতে চুরি ও অন্য অপরাধে বিভিন্ন প্রকারে দণ্ডিত ব্যক্তির ও দণ্ডের তালিকা আছে। চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিতদের একটা তালিকার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল—

প্রাণদণ্ড—২০জন

দক্ষিণ হস্ত ও বাম পদ ছেদন—১৩ জন

দক্ষিণ হস্ত ছেদন—১৮ জন

দক্ষিণ হস্ত ও একখানি কর্ণ ছেদন—৪ জন

দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ ছেদন—১ জন

একখানি কর্ণ ছেদন—১ জন

একজন লোককে অদ্ভুত সাজে সহরের সর্ব্বত্র ঘুরাইয়া, পরে পেরেক বিদ্ধ করিয়া মারিবার হুকুম হইয়াছিল।

এই তালিকায় উল্লিখিত দণ্ডগুলি নিশ্চয়ই অমানুষিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সহিত ক্রমশঃ লোকের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিরও উৎকর্ষ হইতেছে। সেইজন্য এখন আমাদের নিকট যাহা বর্ব্বরোচিত অমানুষিকতা বলিয়া বোধ হয়, সেকালের লোক বোধ হয় তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডে চুরির জন্য প্রাণদণ্ড হইত। অনেক সামান্য-সামান্য অপরাধের শাস্তিও তখনকার বিলাতী আইনে ছিল প্রাণদণ্ড। নন্দকুমারের বিচারেই বাঙ্গালী তখনকার বিলাতী ব্যবস্থার কঠোরতার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিল। বিলাতের তুলনায় তখনকার মহারাষ্ট্রের প্রচলিত দণ্ড বহু পরিমাণে লঘু ছিল বলিতে হইবে। মারাঠা দেশে কিন্তু একের অপরাধে অন্যেরও শাস্তি হইত। চোরের সহিত তাহার পুত্র পরিবারও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত। এই ব্যবস্থাটি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত।

মারাঠা বিচার-পদ্ধতির দোষগুণ

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ মারাঠা বিচার-পদ্ধতির প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই পদ্ধতিতে বড়লোকদের সুবিধা হইত। সকল দেশে, সকল যুগেই ধনী ব্যক্তিরা বিবিধ উপায়ে আইনের উদ্দেশ্য অল্পাধিক পরিমাণে ব্যর্থ করিয়াছে। দেখিতে হইবে যে, মারাঠা বিচার-পদ্ধতিতে অন্য দেশের বিচার-প্রণালীর তুলনায় বড়লোকের বেশী সুবিধা হইত কি না। শ্রীযুত বিশ্বনাথ কাশিনাথ রাজবাড়ে তাঁহার মারাঠা ইতিহাসের উপাদানের একাদশ খণ্ডে একটি স্বত্বের মামলার বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই মামলায় একপক্ষ ছিলেন তদানীন্তন পেশবার নিকট কুটুম্ব। বিচারক ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী। মামলার বিবরণটি পড়িলেই মনে হয় যে, বড়লোক বলিয়া বা পেশবার আত্মীয় বলিয়া রামশাস্ত্রী চাষকরদিগের প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। একবার চাষকরেরা গোপনে তাঁহাকে কতকগুলি দলিল দেখাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাতে রাজি হন নাই। তিনি রূঢ় ভাষায় বলিয়াছিলেন, "আমি চুরি করিতেছি না,—বিচার করিতেছি। যাহা দেখিতে হয়, শুনিতে হয়,—প্রকাশ্য আদালতে দেখিব ও শুনিব। গোপনে কোন কাজ আমি কাহারও খাতিরে করিব না।" আপত্তি হইতে পারে রামশাস্ত্রী অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি পেশবা রঘুনাথের বিরুদ্ধেও হত্যার অভিযোগ আনিতে ভীত হন নাই; সুতরাং তাঁহার

আচরণ অপর সকল বিচারকদিগের আচরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবারই কথা। রামশাস্ত্রীর অসাধারণ কীর্ত্তি অপর ন্যায়াধীশগণের যশ বহু পরিমাণে ম্লান করিয়াছে সত্য, কিন্তু রামশাস্ত্রী হইতে মারাঠা-সাম্রাজ্যের শেষ ন্যায়াধীশ বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী টোকেকর পর্য্যন্ত সকলেই ন্যায়নিষ্ঠার জন্য অশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং রামশাস্ত্রীর বিচার-প্রণালীই তাঁহাদের সকলের আদর্শ ছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন আরও বলিতেছেন—The judicial system seems to have been imperfect. There was no regular administration of justice, no certain means of filing a suit, and no fixed rule of proceeding after it had been filed. It rested with the officer of Government appointed to receive a complaint or to neglect it altogether. The reception of your appeal from his injustice equally depended on the arbitrary will of his superior. The other occupations of these officers rendered it difficult for them to attend to judicial affairs, even if well disposed, and these occupations increasing with the rank of the officer, the Peshwa who was the main spring of the whole machine, must have been nearly in-

accessible to all men and entirely so to the poor." মারাঠা বিচার-পদ্ধতির কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, ইহা সত্য। আপীল চলিত অনেকবার। দিব্যের আবদার হইত যতবার ইচ্ছা। সুতরাং মামলা-মোকদ্দমার সহজে নিষ্পত্তি হইত না ইহা সত্য। কিন্তু কাজের ভিড়ে মারাঠা কর্ম্মচারীরা বিচারের দিকে মন দিতে পারিতেন না, পেশবার দরবারে দরিদ্রের আবেদন পৌঁছিত না, ইহা সত্য নহে। মারাঠা কর্ম্মচারীদের কার্য্য-বাহুল্য ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু দেওয়ানী মামলার বিচার হইত পঞ্চায়েত-প্রথায়; সুতরাং সে হিসাবে বিচার-বিভাগের কর্ত্তব্য তাঁহাদের নাম-মাত্র ছিল। পেশবা নিজে প্রতি বৎসর সফরে বাহির হইতেন। অনেক জায়গায় ঘুরিতেন, অনেক অপরাধীর বিচার নিজে করিয়া দণ্ড দিতেন, ইহার বহু প্রমাণ আছে। ব্রুটন বলিয়াছেন যে, অভিযানের সময়ে দরিদ্র বিচার-প্রার্থিগণ অনায়াসে এবং বিনা বাধায় দৌলতরাও সিন্ধিয়ার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইত। ইহা দৌলতরাওর চরিত্রের বিশেষত্ব নহে; সেকালকার নরপতিগণের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত প্রথা। মামলার খরচ সেকালে খুবই কম ছিল। ইহাতে দরিদ্রেরাও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। তখনকার বিলাতী প্রথায় কিন্তু বিচারে বিলম্ব হইত ভয়ানক। চেঞ্চারী আদালতের মামলার ফল অনেক সময়ে এক জীবনে জানা যাইত না। ঐ আদালতে একটি মামলার বিচারে ৮২ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। আর সেখানকার মামলার ব্যয়ও ছিল অসাধারণ। ১৮৩১ সালে

এক ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার এটর্ণি ৭০০০ পাউণ্ড বা ১০৫০০০৲ টাকা একটি মামলার পারিশ্রমিক স্বরূপ দাবী করিয়াছিল। অবশ্য কার্য্যবিধি আইন বিলাতের লোকেদের বেশ জানা ছিল। কিন্তু বিচারের বিলম্বের জন্য এবং মামলার ব্যয়-বাহুল্যে সেখানে দরিদ্রের পক্ষে ন্যায়-বিচার লাভ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে স্যার স্পেন্সার ওয়াল-পোল লিখিয়াছেন—"The courts of law were, nominally, open to every Englishman. But those who had experienced the expense and uncertainty of a law suit must have been tempted to add with Horne Tooke 'And so is the London Tavern—to those who can pay.'

কোন পদ্ধতিই একেবারে নির্দ্দোষ নহে। কিন্তু সুবিধা ও অসুবিধার তুলনা করিলে বলিতে হইবে, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিলাতের আদালতে দরিদ্রের পক্ষে মারাঠা আদালত অপেক্ষা সুবিচার পাইবার বেশী সম্ভাবনা ছিল না।

৫

এখনকার মত মারাঠা সাম্রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ডাক-বিভাগ ছিল না। সরকারী চিঠিপত্র বহন করিত দ্রুতগামী হরকরারা। ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহুদূর চলিতে পারিত; অনেক অপরিজ্ঞাত সোজা পথ, পথের আপদ্-বিপদ্, তাহা উত্তীর্ণ হইবার উপায়—ইহাদের নিকট সুপরিজ্ঞাত ছিল। মেজর ব্রুটন ইহাদের চতুরতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ লোকের চিঠিপত্র পাঠাইবার কোন সহজ এবং সস্তা ব্যবস্থা বোধ হয় ছিল না।

স্বাস্থ্য-বিভাগের মত কোন বিভাগও মারাঠা সাম্রাজ্যে ছিল না। কিন্তু চিকিৎসকদিগকে পেশবা-সরকার জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বৃত্তি দান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। পেশবা-দপ্তরের কাগজপত্রে দেখা যায় যে, মুসলমান হকিম, হিন্দু বৈদ্য ও খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী একজন পর্ত্তুগীজ পাদ্রী চিকিৎসক পেশবা-দিগের নিকট হইতে ভূমি ও অর্থসাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিনা পারিশ্রমিকে দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করিতেন, এবং ঔষধের মূল্য গ্রহণ করিতেন না। বোধ হয় এই কারণেই তাঁহারা সরকারী সাহায্য লাভ করিতেন। মুসলমান যুগেও এই প্রকারের নিঃস্বার্থ ও পরোপকারী চিকিৎসকদিগকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। নওসেরার একজন পার্শী চিকিৎসক বিনামূল্যে ঔষধ ও ব্যবস্থা বিতরণের জন্য গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে বার্ষিক বৃত্তি

ও ইনাম জমি পাইয়াছিলেন। সুতরাং এখনকার দাতব্য-চিকিৎসালয়ের সরকারী চিকিৎসকদিগের কাজ বোধ হয় সেকালে এই বৃত্তিভোগী চিকিৎসকদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হইত।

শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল অনেকটা এইরূপ। ডিরেক্টার অব্ ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন্‌ও ছিল না, উচ্চ বেতনের সরকারী অধ্যাপকও ছিল না; সরকারী বিদ্যালয়ও তখনকার লোকের কল্পনার অতীত ছিল। বড় বড় অধ্যাপক ভারতের বিবিধ বিদ্যা-কেন্দ্র হইতে বিদ্যার্জ্জন করিয়া আসিয়া দেশে টোল খুলিতেন। সেই টোলে বালকেরা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করিত। পেশবা-সরকার এই সকল পণ্ডিতকে গুণানুসারে প্রতি বৎসর দক্ষিণা দান করিয়া পুরস্কৃত করিতেন। এই দক্ষিণা দানের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন তালেগাঁও-নিবাসী দাভাড়েরা। ত্রিম্বকরাও দাভাড়ের মৃত্যুর পর পেশবাগণ এই দক্ষিণা বিতরণের ভার গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র প্রকৃত পণ্ডিতগণই নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিবার পর উপযুক্ত দক্ষিণা পাইতেন। তাঁহাদের গুণের বিচার করিতেন পণ্ডিত রাও স্বয়ং। কিন্তু কালক্রমে এই নিয়মের ব্যত্যয় হইয়া পণ্ডিত-অপণ্ডিত-নির্ব্বিশেষে সকল ব্রাহ্মণই দক্ষিণা-বৃত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা ভারতের সকল প্রদেশ হইতে শ্রাবণ মাসে রাজধানীতে সমবেত হইতেন, এবং পক্ষাধিক কাল আহার্য্য লাভের পর দক্ষিণা লইয়া ফিরিয়া যাইতেন। ইহাতে প্রকৃত পণ্ডিত অপেক্ষা ভিক্ষুকের সংখ্যাই বাড়িয়া গেল; এবং সরকারী তহবিলের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইলেও, দক্ষিণাবৃত্তির মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইত না। এইজন্য পেশবা প্রথম মাধব রাও আবার বৃত্তি-প্রার্থীর গুণ ও বিদ্যার পরীক্ষা লইয়া দক্ষিণাদানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সহিতই তাঁহার ব্যবস্থাও লোপ পায়। শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও সমাগত ব্রাহ্মণমাত্রকেই দক্ষিণা দিতেন। তাঁহার পতনের পর, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন দক্ষিণার টাকায় একটি পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ পাঠশালা এখন আর নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি কলেজে ছাত্রদিগের অধ্যয়ন-স্পৃহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কয়েকটি দক্ষিণার (ফেলোশিপের) ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণার টাকায় নানা বিষয়ে মারাঠী গ্রন্থ রচনারও ব্যবস্থা হইয়াছে।